যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রতি খ্রিস্টীয় মাসের ১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ১ ● ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● ঢাকা রবিবার ● ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ● ২২ জামাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

অনন্য এক হায়দার

৪ ❖ পৃষ্ঠা

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

‘মহান বিজয়ের যাত্রাপথে হারিয়েছিলাম অগণিত আলোকিত প্রাণ। তাঁদের প্রেরণা চীর ভাস্বর, অন্ধকার মুক্তিতে দীপ্যমান।’ আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সৃষ্টির মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতি হারিয়েছিল এই বীরদের। সারাদেশের মত পাবনায়ও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বিভিন্ন সংগঠন দিনটিকে স্মরণ করবে। প্রধান কর্মসূচি শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আগামী মঙ্গলবার ৫৫তম মহান বিজয় দিবস। বাঙালির হাজার বছরের লড়াই সংগ্রাম, এবং সশস্ত্র জনযুদ্ধের ফসল এই স্বাধীন বাংলাদেশ। দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে এরইমধ্যে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, পাবনা প্রেসক্লাব, গণশিল্পী সংস্থাসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

বর্ষপূর্তি ও মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

দেশের অন্যতম পাঠকপ্রিয় মাসিক জাতীয় সংবাদপত্র সম্প্রীতি বাংলাদেশ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো। এই শুভক্ষণে সকল পাঠক, লেখক, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারি, মুদ্রণকর্মী, বিজ্ঞাপণদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষি, সম্প্রীতি পরিবার ও অন্যান্য সহযোগিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। একইসঙ্গে সকলকে জানাই ৫৫তম মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। -সম্পাদক

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পাথর ছড়ানো পথে পথে ঝরণা রচনা

শুভ মাহমুদ

‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ তিন বছরে পা রাখছে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল চব্বিশটি মাস। আমাদের ভালোবাসার, আমাদের আলো-আশার- এই মাসগুলি, এই দিনগুলি দেশ ও পৃথিবীর নানা অভিজ্ঞতা পেরিয়ে চরৈবেতি যাত্রায় শামিল। আশা করি অব্যাহত থাকবে সম্প্রীতি’র এই চলা– নতুনদের অংশগ্রহণে প্রবীণদের প্রাণের উত্তাপে।

মাসিক এই পত্রিকাটি আমরা বের করতে চেয়েছিলাম ‘সম্প্রীতি পাবনা’ নামে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশনার অনুমতি মিলল ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ নামে। এই প্রত্যাশা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নগরবাড়ি নৌবন্দর চালু

আশা পূরণ কতো দূর

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে এবং রাজধানী ঢাকা সিটি থেকে পশ্চিমে ১০৫ কিলোমিটার দূরে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নগরবাড়ি আধুনিক নৌবন্দর অনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর যমুনা নদী তীরে দেশের ৪৬তম এই নৌবন্দরের উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

উৎপাদনে নেই বিপণনে সেরা

‘দুধের গরু’র গ্রাম ‘মথুরাপুর’

আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

পাবনার চাটমোহর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম মথুরাপুর। কয়েক দশক আগেও দারিদ্রতা, কর্মসংস্থান সংকটের কারণে গ্রামের অনেকেই কাজের সন্ধানে দূর দূরান্তে ছুটে যেতেন। কৃষিকাজ আর গবাদি পশুপালন করে বছরের পর বছর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে দেশের আর পাঁচটি গ্রামের মত সাধারণ জীবনযাপন ছিল মানুষের। গত দুই দশকে পুরোপুরি পাল্টে গেছে সেই গ্রামের চিত্র।

যে গ্রামের মানুষকে একসময় কাজের জন্য ছুটতে হত দূর দূরান্তে সেই গ্রামেই এখন দেশের প্রায় সব জেলা থেকেই মানুষ আসে কাজ পেতে। তবে এটা কোন বিশেষ বিনিয়োগ বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নয়, গ্রামের মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য বদল করেছেন উন্নত জাতের গাভি সরবরাহের মাধ্যমে।

আশ্চর্যের বিষয় হল- মথুরাপুর গ্রামে নেই কোন বড়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

DCH TRUST

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে সম্প্রীতি বাংলাদেশ কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৪১

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

৮

রবিবার
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
২২ জমাদিউল সানি

আবাদ হচ্ছে ৯ লাখ টন পেঁয়াজ

- বীজতলা তৈরিতে ব্যস্ত কৃষক
- আমদানি চাননা উৎপাদকরা

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার পেঁয়াজ চাষীরা এখন বীজতলা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তারা জানান, জমির কর্দমাক্ত মাটিতে বিশেষ পদ্ধতিতে ছাঁই ছিটিয়ে জমি চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত করার পর বীজ ছিটানো হয়েছে। এই বীজ থেকে ৪৫ দিনে চারা হবে। সেই চারাই লাগানো হবে জমিতে। এরপর তিন মাসের মধ্যে পরিপক্ক পেঁয়াজ মিলবে। কৃষি অধিদফতর জানিয়েছে, এবার পাবনায় প্রায় ৯ লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে পেঁয়াজের ভান্ডার খ্যাত গাজনার বিল অধ্যুষিত সুজানগর ঘুরে জানা গেছে, কয়েকদিন পরেই শুরু হবে হালি পেঁয়াজের আবাদ। তার আগে উপজেলায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলেছে বীজতলা তৈরির কাজ। কোথাও কোথাও এখনও বীজতলা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা। দেখা গেছে, উপজেলার বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে অব্যাহত আছে পেঁয়াজের বীজ তলা তৈরির কর্মযজ্ঞ। জমিতে কাউকে কাউকে ব্যস্ত দেখা গেছে, পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ করতে। কাউকে কাউকে ব্যস্ত দেখা গেছে, বিলের কর্দমাক্ত মাটিতে বিশেষ পদ্ধতিতে ছাঁই ছিটিয়ে জমি চাষাবাদের উপযুক্ত করতে। আবার যে জমি উপযুক্ত হয়েছে চাষাবাদের জন্য, সেই জমিতে কৃষককে ব্যস্ত দেখা গেছে বীজ ছিটানোর কাজে। অনেকে ব্যস্ত ছিলেন ছিটানো বীজের পরিচর্যার কাজেও। এ সময় হাটখালি গ্রামের পেঁয়াজ চাষী রানা মিয়া জানান, রোপনকৃত বীজ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মাটির অভাব

ধুঁকছে মৃৎশিল্প

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার অনেক স্থানেই মৃতশিল্পীরা মাটির অভাবে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় মাটি না পাওয়ায় তাঁরা মাটির বাসন-কোসন তৈরি করতে পারছেন না।

এ ব্যাপারে মৃতশিল্পের অন্যতম প্রসিদ্ধ এলাকা সুজানগরের মানিকহাট ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই খান বলেন, এক সময় এই উপজেলার রাইপুর, মাছপাড়া, মানিকহাট, মানিকদীর পালপাড়া, হেমরাজপুর, সাতবাড়ীয়া, সাগরকান্দী এবং শ্যামগঞ্জসহ বিভিন্ন গ্রামে পর্যাপ্ত পাল পরিবার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পাবনায় পাঁচ মাসে ৬ কোটি টাকা লেনদেন

দেড় লক্ষাধিক বস্তা শামুক নিধন

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার খাল-বিল থেকে চলতি মৌসুমে বিপুল পরিমাণ শামুক ধরা হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং অনলাইন পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, ধরা বা সংগ্রহ করা এই শামুকের পরিমাণ দেড় লক্ষাধিক বস্তা। যা বিক্রির মাধ্যমে মাত্র পাঁচ মাসে ৬ কোটি টাকার কারবার করা হয়েছে। তথ্য বলছে, প্রতি বছরই পাবনার খাল-বিল থেকে অবাধে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রাণ-পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম শামুক। মৌসুমের একটা নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত এই হরিলুট কারবার চলে। গত পাঁচ মাস সেই কারবার করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাবনার প্রায় অর্ধশত স্থানে আড়ত স্থাপন করে দেড় লক্ষাধিক বস্তা শামুক সংগ্রহ করার পর তা বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এজন্য পাবনার সাঁথিয়া, বনগ্রাম, সদরের কুচিয়ামারা, বাগচিপাড়া, ফরিদুপর উপজেলার বিভিন্ন স্থান, চাটমোহর, ঈশ্বরদীর মূলাডুলি, রাজাপুর, গোপালপুর, চান্দাই, দাসগ্রাম, কদিমচিলান, আটঘরিয়া উপজেলার ডিকশি বিল, গড়মাটি, মাঝগ্রাম, কাছিমপুর, রামনাথপুর, মহেশ্বর কুজিপুকুর, কলসনগর, ভাঙ্গুড়া উপজেলার সোনাগাদনের বড় বিল, চাটমোহরের চলনবিলের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী আড়ত স্থাপন করা হয়। ঈশ্বরদীর মুলাডুলি বাজারে শামুক বিক্রির বড় আড়ত করা হয়। শুধু চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার নদ-নদী, ছোট-বড় বিলসহ অন্তত ৩০টি স্থানে প্রায় ৪০০ নৌকায় করে প্রতিদিন শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি চলনবিলের তাড়াশ, আটঘরিয়া উপজেলার বড়বিল, সোনাগাদনের বিল, গাজনার বিলসহ ২০-২৫ স্থানে প্রায় পাঁচশ নৌকায় প্রতিদিন শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন বিল অঞ্চল থেকে শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ব্যতিক্রমী চাষাবাদ

চাটমোহরে নারী নেতৃত্বে আবাদ বিনাহালের রসুন

শিশির ইসলাম

পাবনার চাটমোহরে চলছে ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়ায় রসুনের আবাদ। এ আবাদ হচ্ছে বিনাহালে। আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন নারীরা। উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে এ চাষাবাদ হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রায় দুই দশক ধরে এখানে বিনাহালে রসুনের আবাদ হচ্ছে। এই রসুন রোপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন নারীরা। বীজ বাছাই ও রোপনে কাজ করেন তারা। এ কাজে একজন মহিলা কৃষিশ্রমিক প্রতিদিন ৩শ থেকে ৪শ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। পুরুষরা পাচ্ছেন ৫শ থেকে ৬শ টাকা মজুরি পান।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩,৮৫০ হেক্টর জমিতে আবাদ করে ৩৭,১৫০ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছিল, গড় ফলন ছিল ৯.৬৫ মেট্রিক টন। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪,৫৫০ হেক্টর জমিতে আবাদ করে ৪৭,৯১৫ মেট্রিক টন রসুন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, পাবনা জেলার মধ্যে চাটমোহর উপজেলাতেই কেবল এই পদ্ধতিতে (বিনাহালে) রসুনের আবাদ হয়। পাশের জেলা নাটোরের গুরুদাসপুর, সিংড়া, তাড়াশ উপজেলাতে এ পদ্ধতিতে রসুনের চাষ হয়। কৃষকদের ভাষ্য, এই পদ্ধতির চাষাবাদে খরচ ও ঝামেলা কম। অন্যান্য ফসলের চেয়ে লাভ অনেক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বাউল সাধকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশব্যাপী বাউল সাধকদের উপর হামলার প্রতিবাদে এবং হামলাকারীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২৭ নভেম্বর সকালে পাবনার ফকির সাধু, বাউল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। এ সময় তারা আটক বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিও জানান।

জেলা বাউল ফকির সংস্থার সভাপতি আবুল ফকিরের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এদেশ বাউল সাধকদের। এ দেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ। এখানে কোন মৌলবাদীর ঠাঁই নেই। আগামীতে আবার কোন হামলা কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট পাবনার সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর চৌধুরী, ফকির লালন অনুরাগী সংঘের আহবায়ক আবদুল কাইয়ুম, কূলনাশা বাউল সংঘের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল সাধু, মিনুস বাউল, বাউল অনুরাগী রবিউল রনি, সাংস্কৃতিক সংগঠক বিপ্লব ভৌমিক, রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি পাভেল হাসান জাহাঙ্গীর, বাউল সাধক অনুরাগী সবুজ কিংশুক, লিটন বাউল প্রমুখ।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti **পাবনা অফিস :** মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্না রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

শ ই শিবলী আত্মার আত্মীয়

শুচি সৈয়দ

'টালত মোর ঘর, নাহি পড়বেশি
হাড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেসী'।
অর্থ : টিলার উপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই, নিত্যই অতিথি।

১.
বাংলাসাহিত্যের প্রচীন নিদর্শন চর্যাপদের পদ থেকে যিনি তাঁর সম্পাদিত ছোট কাগজের 'আবেসী' নামটি নির্বাচন করেছিলেন সেই শ ই শিবলীকে আমরা কতটাই বা চিনেছি, কতটাই বা চিনতে চেয়েছি। চর্যাপদের পদ থেকে কেবল একটি শব্দ নির্বাচনই নয়, তিনি যেন ছিলেন পুরো পদটিরই প্রতিমূর্তি। আপন টিলায় ধ্যানী এক ঋষি, যার হাড়িতে ভাত না থাকলেও, অতিথির অভাব ছিল না কখনও। তার কাছে কেউ ভাতের জন্য জড়ো হয়নি, জড়ো হয়েছে আলোর জন্য। সে কী জ্ঞানের আলো? না, সে আলো প্রাণের আলো। প্রাণস্পন্দনের আলো। প্রাণের নিভৃতে থাকা শুভবোধ, শুভকর্মকে আরেক মানুষের প্রাণে সঞ্চারিত করার, পৌঁছে দেবার প্রেরণার আলো। সে আলো সবখানে ছড়িয়ে দেবার তাড়নার আলো। শিবলী ভাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই টিলার উপরে থাকা ঋষির মতই নির্বাপিত করে দিলেন নিজের জীবন–চুপি চুপি, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসা মৃত্যুকে, এমন তাড়িয়ে তাড়িয়ে কেউ জীবনানন্দের মত উপভোগ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। কেউই তো জানার সুযোগই পেল না। না ভাবী। না সুদীপ্ত। না সুহৃদ। না আমরা!!

২.
চীন বিপ্লবের নেতা মাও সে তুং চীনের বিপ্লবীদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারী ডা. নরম্যান বেথুনের শোকসভায় বলেছিলেন, 'কোনো কোনো মৃত্যু পাখির পালকের চেয়ে হালকা। আর কোনো কোনো মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়ে ভারী'। এটি বোধকরি একটি চীনা প্রবাদও। এই বাক্যটিই আমার বোধকে স্তব্ধ করে রেখেছে শিবলী ভাইয়ের অকাল প্রয়াণে। অপরিসীম এক শূন্যতার বোধ স্থাণু করে দেয় অনুভূতিকেও। আমার ভালোবাসার একটা ঠাঁই, একটা আশ্রয় হারিয়ে গেল। মানুষের জীবনে ভালোবাসার ঠাঁই হারাবার বেদনার চেয়ে বড় কোনো বেদনার কথা আমার জানা নেই। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে জীবনের যে মুহূর্তসমূহ তার মধ্যে ভালোবাসার ঝলকানিটুকুই একমাত্র অমৃত। আমাদের জীবন থেকে সেই অমৃতের স্বাদ, অমৃতের সান্নিধ্য অন্তর্হিত হল তাঁর অকাল প্রয়াণে–আমি এই মৃত্যুকে অকালই বলবো। এটাই আমার অনুভূতি।

৩.
রক্তের সম্পর্কে তিনি আমার কেউ নন। তাহলে আমার কাছে কী ছিলেন তিনি? কে ছিলেন তিনি?? তিনি ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম ভাই! বন্ধু! সহযোদ্ধা! শিক্ষক! সর্বোপরি পিতৃপ্রতিম এক অস্তিত্ব!! এই সম্পর্ককে কী আত্মার সম্পর্ক বলে? অলৌকিক সত্তার সম্পর্ক কী এ-ই? চেতনার সম্পর্কের আত্মীয়তা? জানিনা, তবে এর চেয়ে বড় সম্পর্ক রচনার সাধ্য বোধকরি মানুষের নেই।

৪.
কত তর্ক, কত ঝগড়া, মান-অভিমান তার সঙ্গে–কিন্তু কোনো মালিন্য ছোঁয়নি আমাদের–আমরা কখনও পর হয়ে যাইনি কারও কাছে, এমনই অচ্ছেদ্য আপন–যেন জন্মান্তরের সহোদর–আমরা সবাই।
কবি ছিলেন সমস্তসত্তায়!! তাই–
''ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভেতরে বিষের বালি, মুখ বুজে মুক্তো ফলাও''–
এই পঙক্তির মতোই জগৎঋষির নির্লিপ্ততায় চলে গেলেন অমরালোকে।

শিবলী ভাই, কেমন আছো

নাদিরা আহসান লিপি

শিবলী ভাইয়া তুমি কেমন আছ? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা তুমি দেখে ফেলেছো। একটু যত্ন, ভালবাসা, আন্তরিকতার অভাব তুমি খুব বেশি পেলে। চলে গেলে অচেনায়। ভাষাবিদ তুমি। তোমাকে সান্তনা দেবার ভাষা আমি কোথায় পাব। তোমাকে নিয়ে কিছু ভাববো তাও বা কী করে হয়? তোমার ভাবনার আকাশ এতো বিশাল, তাই তোমাকে নিয়ে ভাবার সাধ্য আমার নেই। তোমার অভাববোধ যে কতখানি তা তোমাকে কী করে জানাব। তাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে জানাতে পারিনি। তুমি এই পৃথিবীতে নেই, এই কথাটা আমি ভাবতেও পারিনা। তুমি নেই, অথচ আমি আছি। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তুমি-ই বলো? তুমি হলে কি তা বিশ্বাস করতে? তাহলে আমি কিভাবে তা পারব? শিবলী ভাইয়া আমি সত্যিই আর চুপ করে থাকতে পারছি না।
২৬/১১/২০১৪ যখন তুমি পঙ্খিরাজে উড়ে যাবার মত Ambulance-এ উঠলে আমি জিজ্ঞেস করলাম: শিবলী ভাইয়া, আজ জয়ীর মেহেদি সন্ধ্যা। আগামীকাল হলুদ, ২৮ তারিখে ওর বিয়ে। জয়ীর বিয়ে। আমি কি করব? তুমি বললে, কাঁদবে না একদম। কর্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে করবে। ঠিক আছে মেনে নিলাম, তুমি যখন বললে। ফিরে এসে একে একে সমস্ত কর্তব্য শেষ করেছি। আমি তোমার কথা রেখেছি শিবলী ভাইয়া। আমি তোমার কথা আর ক্ষমতাকে সম্মান করি।
আমি অনুভব করতে পারি। যখন তুমি আমাদের মাঝে ছিলে, কী অসীম সাহস আর ক্ষমতা ছিল তখন। আমি মনে করি, তুমি এখনও আমাদেও মাঝেই আছ। চোখে না দেখলেও তোমার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। হয়তো তা প্রকাশ করা যায়না। আমার এই প্রকাশ না করতে পারার ব্যর্থতাকে ক্ষমা কর শিবলি ভাইয়া। তুমি যেন সারাজীবন সবার মনে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাক। এই কামনা করি। হে দয়াময়, আমার ভাইয়াকে তুমি হেফাজত কর। কারণ তুমিই সর্বাপেক্ষা হেফাজতকারী।

নাদিরা আহসান লিপি: শ ই শিবলীর ছোট বোন

শ ই শিবলী জীবনপঞ্জি

শফিকুল ইসলাম শিবলী পাবনা শহরে ১৯৫৫ সালের ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুনশী রজব আলী, মা হাফিজা খাতুন। বার ভাইবোনের মধ্যে তিনি অষ্টম সন্তান। মহিমচন্দ্র জুবিলি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে স্নাতক সম্মান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজশাহী আইন মহাবিদ্যালয় থেকে এল এল-বি ডিগ্রি নেন। ১৯৮২ সনে ৪ এপ্রিল আইনজীবী হিসাবে সনদ লাভ করেন। পেশা জীবনে তিনি ছিলেন পিতার মতই একজন আইনজীবী।
স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখিতে তার হাতেখড়ি। কলেজ জীবন থেকে ছোটকাগজ এবং সাময়িকী সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত। তার সম্পাদিত ছোটকাগজের নাম 'আবেসী'। ১৯৮১ সালের ৩০ এপ্রিল তার সম্পাদনায় পাবনা থেকে থেকে বের হয় সাপ্তাহিক 'বিবৃতি'। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৮ সনে গড়ে ওঠা সাপ্তাহিক স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর কবিকণ্ঠের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আরশী'। ছিলেন 'পাবনা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শহীদ মওলানা কসিমুদ্দীন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক। পাবনা প্রেসক্লাব ও আইনজীবী সমিতির অন্যতম সদস্য। তার সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে পাবনা বারের বার্ষিকী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জাতীয় পর্যায়ের স্মারক গ্রন্থ, কবি বন্দে আলী মিয়ার জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্র'র জন্মবার্ষিকী স্মারক 'আবির্ভাব'সহ অসংখ্য পত্রপত্রিকা। মৃত্যুকালে তিনি সহধর্মিনী জান্নাতুল নওরোজ মুন্নী, ২ সন্তান মিনহাজ-উল ইসলাম সুদীপ্ত ও মিরাজ-উল ইসলাম সুহৃদ সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

পাবনা মেডিকেল কলেজে হিস্ট্রি অব মেডিসিনের প্রেজেন্টেশন

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা মেডিকেল কলেজে হিস্ট্রি অব মেডিসিনের উপর গুরুত্বপুর্ণ প্রেজেন্টেশন গত ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চিকিৎসা শাস্ত্রের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ প্রেজেন্টেশন উপস্থান করেন আর্মস ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসেস'র সাবেক মহাপরিচালক ও দেশের বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল (অব.) ডা. রবিউল হোসেন। তিনি প্রায় দেড় ঘন্টার 'হিস্ট্রি অফ মেডিসিন' শীর্ষক সচিত্র তথ্যবহুল প্রেজেন্টেশন ছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।
এসময় পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত নাগ, ক্যাপ্টেন (অব.) কামরুল হোসেন, ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) আনিসুর রহমান, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, পাবনা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. এএম শাফিকুল হাসান, চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক আমিনুর রশিদ আকন্দ, পাবনা মানসিক হাসপাতালের পরিচালক ডা. শাফকাত ওয়াহিদ, পাবনা মেডিকেল কলেজের এনেস্থেসিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম শুভ, পাবনা মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডা. মাসুদুর রহমান প্রিন্স এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, ফার্স্ট ইয়ার ও ফিফ্থ ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেডিসিনের উপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল (অব.) ডা. রবিউল হোসেন।

ফটোসেশনে মেজর জেনারেল (অব.) ডা. রবিউল হোসেনের সঙ্গে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত নাগ, ক্যাপ্টেন (অব.) কামরুল হোসেন, ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) আনিসুর রহমান, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, পাবনা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. এএম শাফিকুল হাসান, চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক আমিনুর রশিদ আকন্দ, পাবনা মানসিক হাসপাতালের পরিচালক ডা. শাফকাত ওয়াহিদ, পাবনা মেডিকেল কলেজের এনেস্থেসিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম শুভ, পাবনা মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডা. মাসুদুর রহমান প্রিন্স প্রমুখ **ছবি : সম্প্রীতি বাংলাদেশ**

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সড়ক দুর্ঘটনা

গ্রাফিক ডিজাইনার খালেদ জাবেদ গুরুতর আহত

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সড়ক দুর্ঘটনায় সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর গ্রাফিক ডিজাইনার এম কে খালেদ জাবেদ গুরুতর আহত হয়ে রাজধানী ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। গত ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর উত্তরায় উল্টোপথে চলা একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তাঁর হাত ও পা ভেঙে যায়। পরে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে খালেদ জাবেদ পঙ্গু হাসপাতালের ৭০৪ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন আছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর হাত ও পায়ে একাধিক অপারেশন জরুরি।

এ ঘটনায় সম্প্রীতি বাংলাদেশ পরিবার থেকে তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা এবং ঘাতক বাস চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়েছে। খালেদ জাবেদের আহত হওয়ার ঘটনায় তাঁর সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষিরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পরিবার-পরিজনসহ সবাই তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

চাটমোহরের আহসানুজ্জামান তৌকির জয় করলেন হিমালয়ের 'আমা দাবালাম' পর্বত

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ষষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে হিমালয়ের অন্যতম টেকনিক্যাল পর্বত 'আমা দাবলাম' জয় করেছেন পাবনার চাটমোহর সদরের আহসানুজ্জামান তৌকির (২৭)। নেপালের সময় ৪ নভেম্বর বেলা ১টার দিকে ৬ হাজার ৮১২ মিটার উচ্চতার 'আমা দাবলাম'-এর চূড়া স্পর্শ করেন তিনি।

পর্বতারোহণ বিষয়ক অর্গানাইজেশন রোপ ফোরের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে এ অভিযানটি পরিচালিত হয়। এই অভিযানে তৌকিরে সঙ্গী ছিলেন রোপ ফোরের আরেক তরুণ আবরারুল আমিন অর্ণব।

প্রসঙ্গত, খাড়া বরফ দেয়াল, গভীর ক্রেভাস, ঝুলন্ত বরফ খন্ড এবং কঠিন আবহাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম চ্যালেঞ্জিং পর্বত এই 'আমা দাবলাম'। তৌকিরের এ অভিযান ছিল বাংলাদেশি পর্বতারোহণ ইতিহাসে এক গৌরবময় সংযোজন।

চূড়ায় পৌঁছার প্রতিক্রিয়ায় তৌকির গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমা দাবলাম আমার কাছে শুধু একটা পর্বত নয়, এটা ছিল নিজের সীমা পরীক্ষা করার যাত্রা। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এই পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন লাল-সবুজ পতাকাটা তুলে ধরলাম, তখন মনে হলো এটি শুধু আমার সফলতা নয়, এটি বাংলাদেশের সকল তরুণের স্বপ্নের স্পন্দন।'

গত ১২ অক্টোবর দুঃসাহসিক এই অভিযানের জন্য দেশ ছেড়েছিলেন তৌকির। এরপর অভিযানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু হয় মূল অভিযান। হিমালয়ের পাহাড়ি বন্ধুর পথ ধরে ট্যাকিং করে তিনি বেস ক্যাম্পে পৌঁছান ২২ অক্টোবর। সেখানে তিনি উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায় কৌশল চর্চা বা 'অ্যাক্লিমাটাইজ রোটেশন' শুরু

করেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদের ২৯ অক্টোবর সামিটের কথা থাকলেও ২৭ অক্টোবর থেকে হিমালয়ে শুরু হয় তীব্র তুষারপাত। এর মধ্যেই তৌকির অবস্থান করেন আমা দাবলাম ক্যাম্প-১-এ, যার উচ্চতা প্রায় ১৯ হাজার ফুট। ২৮ অক্টোবর আবহাওয়া আরও খারাপ হলে তাঁদের শেরপা লিডার সিদ্ধান্ত নেন বেস ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার। তীব্র তুষার ঝড়ের মধ্যে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে তাঁদের দল বেস ক্যাম্পে পৌঁছায়।

এদিকে তীব্র তুষার পাতের কারণে ফিক্সড রোপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবহাওয়া ভালো হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় পাঁচ দিন। তারপর রুট ওপেন হওয়ার সুখবর আসে। নভেম্বরের ২ তারিখ শুরু হয় সামিট বিট। এদিন তৌকির পৌঁছে যান ১৯ হাজার ফুট উচ্চতার ক্যাম্প-১-এ। এরপর ৩ তারিখ ইয়োলো টাওয়ার খ্যাত ১৯ হাজার ৬৮৫ ফুট উচ্চতার ক্যাম্প-২-এ পৌঁছে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে শুরু করেন সামিট পুশ। তীব্র বাতাস, ফিক্সড রোপে অতিরিক্ত ট্রাফিক এবং আইস ফলকে উপেক্ষা করে ৪ নভেম্বর ২২ হাজার ৩৪৯ ফুট উচ্চতার 'আমা দাবালাম' চূড়ায় পৌঁছান তিনি।

তৌকির জানান, এর পরের স্বপ্ন পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট এভারেস্ট। এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন। এখন প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতার। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ২০২৬ সালেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় আবারও উড়াতে চান বাংলাদেশের পতাকা।

উল্লেখ্য, এর আগে গত বছরের অক্টোবরে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে নেপালের তিনটি ছয় হাজার মিটার পর্বত চূড়া স্পর্শ করেন আহসানুজ্জামান তৌকির। ২৭ দিনের অভিযানে গিয়ে কোনো শেরপা সাপোর্ট ছাড়াই পর্বতগুলো আরোহণ করেন তিনি। পর্বতগুলো হলো ৬ হাজার ১১৯ মিটার উচ্চতার লবুচে পিক, ৬ হাজার ১৬৫ মিটার উচ্চতার আইল্যান্ড পিক এবং ৬ হাজার ৪৬১ মিটার উচ্চতার মেরা পিক।

আহসানুজ্জামান তৌকির পাবনার চাটমোহর পৌর সদরের বালুচর মহল্লার আকরাম হোসেন সাবু-সুলতানা সামিয়া পারভীন দম্পতির ছেলে। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট তৌকির। তিনি চাটমোহর রাজা চন্দ্রনাথ ও বাবু শম্ভুনাথ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা এবং অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রিপল ই-তে বিএসসি সম্পন্ন করেছেন।

'দুধের গরু'র গ্রাম 'মথুরাপুর'

প্রথম পৃষ্ঠার পর : গো-খামার, কিন্তু তারপরেও এখানে পাওয়া যায় উন্নত জাতের দুগ্ধ উৎপাদনকারী গবাদি পশু। দুগ্ধ সমৃদ্ধ পাবনা ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার খামারি ও কৃষকদের কাছ থেকে উন্নতজাতের গর্ভবতী গাভি সংগ্রহ করে এ গ্রামে নিয়ে আসা হয়। তারপর অনলাইন প্লাটফর্মে সেগুলো তুলে ধরা হয়। যেগুলো দেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খামারিরা ছুটে আসেন ছোট্ট এই গ্রামে। দেখেশুনে দামাদামি করে দুগ্ধ খামারিরা সেসব পশু কিনে নিয়ে যান নিজেদের খামারে।

অতি সম্প্রতি সরজমিনে মথুরাপুর গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, পাকা রাস্তার দুই ধার দিয়ে গরুর খামারের বিশাল বিশাল ঘর। সঙ্গে শোভা পাচ্ছে খামারের নামকরণ। তবে প্রচলিত খামারের মত এখানে নেই পরিপূর্ণ খামার ঘর। গবাদি পশুর জন্য খামারের মডেলে ঘর তৈরি করা হলেও সেগুলোতে নেই কোন বেড়া, যাতে বাইরে থেকে গরুগুলো ভালভাবে দেখা যায়। বলা যায় এগুলো গরুর ডিসপ্লে (প্রদর্শনী) সেন্টার। গ্রামের রাস্তা ধরে সারি সারি এমন উন্মুক্ত খামার দেখে অনেকে আশ্চর্য হলেও এগুলো সবই গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য।

খামারিরা জানান, মথুরাপুর গ্রামের খামারগুলোতে গবাদি পশু পালন করা হয়না, এখান থেকে শুধু বিক্রি করার জন্য আনা হয়। প্রতিটি খামারেই কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫টি দুধেল গরু রাখা হয়। বিক্রি সাপেক্ষে আবার নতুন পশু নিয়ে আসা হয়। এভাবেই বছরের পর বছর চলছে মথুরাপুর গ্রামের 'দুধের গরুর' ব্যবসা। গবাদিপশুর উৎপাদনকারি গ্রাম না হলেও এ গ্রামেই গড়ে উঠেছে দুধের গরুর বাণিজ্যিক বাজার। খামারিরা আরও জানান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গর্ভবতী গরু এবং ক্ষেত্র বিশেষে সদ্য ডেলিভারি হওয়া গরু বাছুরসহ এখানে নিয়ে আসা হয়। গর্ভবতী গরু খামারে নিয়ে আসার পর বাচ্চা প্রসব করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব দুগ্ধ খামার গড়ে উঠেছে, সেসব খামারিরা দেখে-শুনে এখান থেকে তাদের পছন্দের দুধের গরু কিনে নিয়ে যান। দেশের প্রায় ৬৪ জেলা থেকেই খামারিরা এ গ্রামে ছুটে আসেন পছন্দের পশু কিনতে।

মথুরাপুর গ্রামের প্রবীণ গবাদি পশু ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম বলেন, গবাদি পশু সমৃদ্ধ এ অঞ্চল থেকে অতীত থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানের খামারিরা এসে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে তাদের পছন্দের পশু কিনে নিয়ে যেতেন। একসময় আমরাও এসব খামারিদের জন্য বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে পশু কিনে দিতাম। পরবর্তীতে নিজেরাই কিছু দুগ্ধ উৎপাদনক্ষম পশু সংগ্রহ করে ব্যবসায়ী ও খামারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিক্রি করতাম। এতে আমাদেরও কিছু লাভ থাকত, আর দূর দূরান্তের খামারিদেরও কষ্ট লাঘব হত। এভাবে ব্যাক্তি পর্যায়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে গ্রামে গড়ে ওঠে খামারের শেড। বাড়তে থাকে দুধের গরুর আমদানি। ধীরে ধীরে এ গ্রামে গড়ে উঠেছে দুধের গরুর বড় বাজার।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বর্তমানে এ গ্রামে প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি শেড রয়েছে। অন্তত ২০টি নামে এসব শেডগুলোতে সারা বছর অন্তত ৩০০ থেকে ৪০০ উন্নত জাতের দুধের গরু থাকে। প্রতি মাসেই এ গ্রাম থেকে ৩০০ থেকে ৪০০ দুধের গরু দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ২০০৫ সালের পর থেকে গত ২০ বছরে ধীরে ধীরে মথুরাপুর গ্রামে দুধের গরুর বাজার প্রসারিত হয়ে বর্তমানে জেলার অন্যতম প্রধান বাজারে পরিণত হয়েছে।

মথুরাপুর গ্রামের রাশিদুল ইসলাম জানান, এক সময় চা-এর দোকানদারি করে কোনমতে সংসার চালাতেন তিনি। ২০০৫ সালে জমানো টাকার সঙ্গে কিছু টাকা ধার করে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে একটি দুধের গরু কিনে দুই দিন পরেই ২০ হাজার টাকা লাভে বিক্রি করেন তিনি। দুইদিনে ২০ হাজার টাকা মুনাফা হওয়ায় আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। চায়ের দোকান চালানর পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে একটি-দুটি গরু নিয়ে এসে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখতে পাওয়ায় চায়ের দোকান ছেড়ে একটি খামারের শেড গড়ে তোলেন তিনি। নাম দেন রাতুল ডেইরি খামার। তার খামারে এখন ১০ থেকে ১৫টি পর্যন্ত গরু থাকে। প্রতি মাসে অন্তত ১২ থেকে ১৫টি গরু বিক্রি করেন। এতে প্রতি মাসে এক থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায়। খামারে গরু নিয়ে আসার পর দুই থেকে তিনদিন বা সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে সেটি বিক্রি হয়ে যায়।

মথুরাপুর গ্রামের তরুণ যুবক জনি ইসলাম জানান, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেয়ার পর ১০/১৫ হাজার টাকার চাকুরির জন্য ঘোরাঘুরির চেয়ে এক দশক আগে একটি খামারের শেড করে তিনি শুরু করেন দুধের গরুর ব্যবসা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেরা জাতের দুধের গরু সংগ্রহ করে তার খামারে নিয়ে এসে উন্নত পরিচর্যা করে সেগুলোর ভিডিও আপলোড করা হয়। তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় খামারের পেজে। এর পরেই ক্রেতারা সংগ্রহ দেখে যোগাযোগ শুরু করেন। বর্তমানে তার দুটি খামার থেকে প্রতি মাসে অন্তত ১৫ থেকে ২০টি গরু বিক্রি হচ্ছে। আয় হচ্ছে মাসে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত। জনি আরও জানান, তার খামারে গরুর বাছুরগুলো সংরক্ষণের জন্য নেয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া দূর দূরান্তের ব্যাপারিদের থাকার জন্য আবাসিক সুবিধাও রেখেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'গর্ভবতী গরু ও সদ্য প্রসব করা বাছুরসহ গরুগুলো নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলার খামারিদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। দেশের ৬৪ জেলা থেকেই প্রতিদিন এ গ্রামে ছুটে আসছেন খামারিরা, এখান থেকেই নিয়ে দুধের গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খামারগুলোতে।'

সিলেট মৌলভিবাজারের খামারি নুর মোহাম্মাদ জানান, এক সময় খামারের গরু কিনতে তাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়েছে। এখন অনলাইন প্লাটফর্মে পশুগুলোকে দেখার পর ফোনে যোগাযোগ করে এবং ভিডিওকলে সরাসরি পশুগুলোকে দেখার পর, অনেক সময় খামারে না গিয়েও কিনতে পারছেন পছন্দের পশু। মথুরাপুর গ্রামের খামারিরা নিজেদের দায়িত্বে পশুগুলো পাঠিয়ে দেন খামারে। এতে করে পশু সংগ্রহের জন্য সময়, শ্রম ও খরচ বেঁচে যাচ্ছে।

মথুরাপুর গ্রামের সবজি ব্যবসায়ী হাশমত আলি বলেন, প্রত্যন্ত এ গ্রাম থেকে এক সময় কাজের জন্য দূর দূরান্তে ছুটে যেতেন মানুষ। এখন দূর দূরান্তের মানুষই ছুটে আসেন এ গ্রামে তাদের পছন্দের পশু কিনতে। এতে করে গত দুই দশকে দারিদ্র্য পীড়িত এ গ্রামের জীবনযাত্রার চিত্র পুরোই পাল্টে গেছে। গ্রামে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আনাগোনায় গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।

হাশমত বলেন, 'এক সময় এ গ্রামে জমির দাম ছিল বিঘাপ্রতি মাত্র ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। এখন এক কাঠা জমির দাম ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা।'

পাবনা জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, পাবনা জেলা গত কয়েক দশকে দেশের অন্যতম শীর্ষ গবাদি পশু উৎপাদনকারি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এ জেলায় রেজিস্টার্ড খামার রয়েছে প্রায় ৯,৬৬৫টি এবং গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ৮.৫ লাখ। প্রতি মাসে ২৫ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে এ জেলায়। জেলার চাহিদা মিটিয়ে, পাবনার গবাদি পশু ও দুধ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। গবাদি পশু এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে, মথুরাপুর গ্রাম তেমনি একটি উদাহরণ। উৎপাদনকারি না হয়েও এ গ্রামের মানুষ গবাদি পশুর সমৃদ্ধ বাজার সম্প্রসারিত করেছে নিজেদের মেধা আর শ্রম দিয়ে, যা অনুকরণীয়।

পাথর ছড়ানো পথে পথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : এবং প্রাপ্তি প্রমাণ করে 'সম্প্রীতি'র শক্তি। আমাদের অন্তর্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার নাম–'মানুষে মানুষে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।'

যখন পৃথিবী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিপর্যস্ত, তখন আমরা সম্প্রীতি শান্তির অভিলাষী। তাই 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' শুধু বাংলাদেশ নয়, আমাদের বিশ্বাস– গোটা পৃথিবীতে সম্প্রীতি'র বার্তা, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের কড়া নেড়ে গহীন অন্তরে পৌঁছে দেবে। আমরা এক সম্প্রীতি'র পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন এবং পথের সূচনাকারী মাত্র।

২.

'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' একটা অত্যাশ্চর্য, মিরাকল অভিজ্ঞতা। এটি শুধু আমার কাছে নয়, সম্প্রীতি'র গোটা টিমের কাছে। আর এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি দুই বছর পেরিয়ে তিন বছরে পা রাখছে।

একজন স্বপ্নবান প্রমিথিউস– যিনি আমাদের সকল কাজে, যে কাজগুলো মানুষের জন্য, মানুষের উদ্দেশে, মানুষের কল্যাণে নিবেদিত– সেই সমস্ত কাজে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন, আমাদের সঙ্গে হেঁটেছেন– হেঁটেছেন আমাদের গহীন অন্তরে নিরন্তর। সেই শিবজিত নাগ-এর অন্তহীন ভালোবাসায়। আমাদের অজাতশত্রু 'দাদা'ড়তিনি শুধু আমাদের কাছে একজন ভাই নন, একজন অগ্রজপ্রতিম সত্তা নন, যাঁকে বলে–'ফ্রেন্ডস, ফিলোসফার, গাইড' তাই-ই নন, তিনি আমাদের একজন কমরেড, সহযাত্রী, সহযোদ্ধা, সহবোদ্ধা, চির তরুণ প্রাণের প্রতিভূ সত্তা।

আমার কথাগুলিকে স্তুতি বলে মনে হবে পাঠকের কাছে। কিন্তু আমার কাছে আমার অনুভব উপলব্ধির অসম্পূর্ণ অব্যক্ততা মাত্র। আমি জানি, যে শব্দাবলী তাঁকে নিয়ে আমি লিখছি, এর একটি শব্দও তাঁকে প্রভাবিত করবে না, বিন্দুমাত্রও, কারণ তিনি তার কর্মে দীপ্যমান। তবুও কেন কথাগুলো লিখছিড়লিখছি শুধু 'সম্প্রীতি'র বাংলাদেশ' যে একটা মিরাকল সেটা বোঝাতে মাত্র।

'সম্প্রীতি'র প্রিন্টার্স লাইনে যে নামগুলো প্রতিসংখ্যায় ছাপা হয়– সেই প্রতিটি নাম ভালোবাসার ওয়ালে লেখা, আমাদের হৃদয়ে উৎকীর্ণ।

৩.

এক সময় পাবনাতে কোন নিয়মিত পত্রিকা ছিল না। আমরা প্রতি বিষ্যুদবারে সাপ্তাহিক বিবৃতি নিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করেছিলাম। শুধু পত্রিকার শূন্যতা পূরণ নয়– একটা জনপদের শুভবুদ্ধির পক্ষের মানুষদের মাঝে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচনার কাজও আমরা করেছিলাম– বিবৃতি'র মাধ্যমে, সময়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজনের সেই অনিবার্য তাগিদ থেকেই 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ'-এরও জন্ম। শুধু পাবনায় নয়, সারাদেশে আজ অজস্র পত্রিকা, অজস্র লেখক, সাংবাদিক– এমন একটা বাস্তবতায় 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' হয়তো একটি বিন্দু মাত্র। বীজমাত্র। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই বীজ থেকেই জন্ম নেবে সেই বৃক্ষ যা বিশ্বব্যাপী 'সম্প্রীতি' রচনা করবে মানুষে মানুষে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির; আর এমনকি মানুষের সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতারও সমন্বয় সাধনে হবে সহায়ক।

তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে 'সম্প্রীতি'র যাত্রাপথ অনেক দীর্ঘ। আমরা সম্প্রীতি'র পাতায় যে স্লোগানটি উৎকীর্ণ করেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের–'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'– আমাদের অন্তর্গত এই মুক্তি'র অভীপ্সা প্রতিটি মানুষের জন্য। কেবল সম্প্রীতির পাঠকদের জন্য নয়, কিংবা এটি কেবল 'সম্প্রীতি'র স্লোগান-এমনটিও নয়। আমরা 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ'-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় খুব ক্ষুদ্র অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কবিতাটিই ছাপি প্রতিটি সংখ্যায়–এই কবিতাটি শুধু নকশা বা শোভাবর্ধনের জন্য নয়; এই কবিতাটির প্রতিটি শব্দ, বাণী, বিন্যাস– আমাদের 'সম্প্রীতি বাংলাদেশে'র প্রাণের স্পন্দন। যা আমরা প্রাণের তরঙ্গ রূপে ছড়িয়ে দিতে চাই পাঠকের হৃদয়ে– বিশ্বব্যাপী সব মানুষের হৃদয়ে।

কেবল বাংলা ভাষায় নয়, পৃথিবীর অন্যকোনও ভাষায়ও এমন মহত্তম হৃদয়স্পন্দিত করা, চেতনাকে জাগ্রত করা সঙ্গীত আর আছে কিনা আমার জানা নেই! আমি শুধু উপলব্ধি করি রবীন্দ্রনাথের এই বাণীবন্ধ সারা পৃথিবীর মানুষের নিভৃত অন্তরের উদ্ভাসন। বিকশিত অন্তর। সবার সঙ্গে যুক্ত হবার মধ্যদিয়ে যে মহত্তম মুক্তি- সেই মুক্তিই মানুষকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিকশিত জীবনে পৌঁছে দেয়।

আমরা জানি আমাদের পথে পথে পাথর ছড়ানো– সেই পাথরের পথকে আমরা ঝরণায় রূপান্তরিত করার প্রত্যয়ে শামিল থাকবো চরৈবেতি যাত্রায়... অবিরাম।

ধুঁকছে মৃৎশিল্প

শেষের পৃষ্ঠার পর : ছিল। এসব পরিবার তাঁদের তৈরি মৃতশিল্পের বাহারি বাসন-কোসন সুজানগরসহ পাবনার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু এখন প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি তৈজসপত্র বাজার দখল করে নিয়েছে। ফলে মাটির তৈরি বাসন-কোসনের চাহিদা কমে গেছে। তারপরও যেটুকু চাহিদা আছে- মাটির অভাবে তাও পূরণ করতে পারছেন না মৃতশিল্পীরা। মানিকদীর গ্রামের সঞ্জয় কুমার পাল জানান, আগে এলাকার লোকজন পুকুর এবং চরাঞ্চলের কিছু কৃষি জমির মাটি বিক্রি করতেন। সে সময় তাঁদের কাছ থেকে মাটি কিনে এনে হাড়ি, গামলা, কলসি, দই তৈরির সড়া এবং স্যানিটারি চাকাসহ বিভিন্ন ধরনের বাসন-কোসন তৈরি করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সুজানগর উপজেলা প্রশাসন এবং থানা প্রশাসন বালু ও মাটি ব্যবস্থা আইন প্রয়োগ করায় কেউ মাটি কাটতে বা বিক্রি করতে পারছেন না। এমনকি থানায় মাটি কাটা এবং বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেও কোন ফল হচ্ছেনা। ফলে তাঁরা মাটির অভাবে মৃতশিল্প তৈরি করতে না পারায় বেকার হয়ে পড়ছেন। বাধ্য হয়ে অনেকে তাঁদের পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিয়েছেন। সুজানগর থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবর রহমান বলেন, মাটি কাটার অনুমতি দিতে পারেন জেলা প্রশাসক। কেউ অনুমতি নিয়ে এসে মাটি কাটলে কোন সমস্যা নেই। অন্যথায় বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের কবলে পড়তে হবে।

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

অনন্য এক হায়দার

শাকিব লোহানী

মাথা ভর্তি ঘন সাদাকালো চুল, উপরের ঠোঁটখানা পুরোপুরি ঢেকে আছে বিশ্বখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির মত মোটা গোঁফ দিয়ে। এই অবয়বের সদা হাস্যোজ্জল লম্বা একহারা মানুষটি ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় কবি মাকিদ হায়দার। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে খ্যাতিমান এই কবি ও প্রাবন্ধিক জন্মেছিলেন বাংলাদেশের পাবনা শহরের সন্নিকটে অবস্থিত দোহাড়পাড়া নামের গ্রামে।

তাঁর সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা দিয়েই লেখা শুরু করি। অল্পদিনের জন্য পড়াশোনা করেছেন পাবনা জিলা স্কুলে। সে সময় বড় ভাই প্রয়াত শামীম লোহানীর স্কুল-সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। পরে তিনি আর এম একাডেমী থেকে স্কুল মাধ্যমিক পরিক্ষা পাশ করে ঐতিহ্যবাহী পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণসংযোগ ও গণমাধ্যম বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং সংস্থার মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দৈনিক ভোরের কাগজে এক উপ-সম্পাদকীয়তে তিনি প্রিয় শিক্ষক, জন্মভূমি এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছিলেন। শিক্ষাবিদ ও লেখক পিতা তাসাদ্দুক লোহানী’র কথা, বড় ভাইয়ের কথা ও আমাদের পরিবারের কথা তাঁর প্রাঞ্জল কথামালা আর উপমায় জীবন ফিরে পেয়েছিলো। কবির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসায় আমরা তখন ভেসেছি। সেই প্রিয় তিনি, সত্তর দশকের অন্যতম প্রধান কবি, মৃত্যুবরণ করেন ১০ জুলাই ২০২৪, রাজধানী ঢাকার উত্তরায়, নিজ বাসভবনে।

তাঁর জীবনের শুরুর দিকের কথা। পাবনার ঐতিহ্যবাহী ললিতকলা কেন্দ্র, ইনিস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস (ইফা), ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শহরের প্রাণকেন্দ্র লাহিড়ী পাড়ায় শুরু হয় ইফা’র কর্মকাণ্ড। তরুণ মাকিদ হায়দার তখন স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। সাহিত্য ও সঙ্গীতের পারিবারিক আবহে বড় হয়ে ওঠা তরুণের স্বপ্ন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক বা দেবব্রত বিশ্বাসের মত খ্যাতিমান শিল্পী হওয়া। হৃদয়ের গভীরে প্রথিত গানের প্রতি টান নিয়ে তিনি ইফা’র প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে সংগীতচর্চা শুরু করলেন। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন,‘৫৬ বছর আগের এক দাবদাহের বিকেলে আমাকে আমার প্রিয় হারকিউলিস সাইকেলে চেপে নিজেদের দোহারপাড়া গ্রাম থেকে যেতে হয়েছিলো শহরের সেই ইফাতে।

২০১৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল পাবনায় অনুষ্ঠিত ইফা’র ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাঁর প্রাণময় উপস্থিতি ছিল উৎসবে আগত সবার জন্য আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ভাগ করে নেয়ার এক বিশেষ দিন। তাঁর দীর্ঘ স্মৃতিচারণ বক্তৃতায় আমরা প্রাণভরে শুনেছি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উচ্চাংগসংগীত শিল্পী, একুশে পদকে সম্মানিত ও মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত বারীণ মজুমদারের ইফা’র সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কথা। বারীণ মজুমদার ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি মাকিদ হায়দার গল্পের মত করে স্মৃতিচারণে ইফা’র জন্য বারীণ মজুমদারের আগ্রহ ও উদ্যোগের কথার উল্লেখ করেন ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনায়। ইফা’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ‘শতাব্দীর কথামালা’ গ্রন্থে স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, ‘বারীণ মজুমদার, শৈলেশ সান্যালকে নিয়ে ইফাতে ঢুকেই প্রথমে যেতেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে। তাঁরা উভয়েই জানতে চাইতেন উচ্চাংগসংগীত এবং তবলার তাল-লয় বোল, ঠিকমত শিক্ষকেরা শেখাচ্ছেন কিনা? আমরা কিশোরেরা সমবেত কণ্ঠে বলতাম, শেখাচ্ছেন।’ কৈশোরের দিনগুলোতে তাঁর জীবন আলোকিত হয়েছে দেশের বরেণ্য এমন সংগীতসাধকদের সান্নিধ্যে।

কবি মাকিদ হায়দারের পিতা শেখ মোহাম্মদ হাকিম উদ্দিন ও ছোট কাকা আবু সাঈদ আবুল কাশেম দুজনেই ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী মানুষ। ত্রিশ এর দশকে সন্তানদের সংগীতচর্চার জন্য হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার, এস্রাজ, ডুগি কিনে দেয়া হয়। কাকা আবুল কাশেম ছিলেন স্বনামধন্য নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও শক্তিমান অভিনয় শিল্পী। তিনি উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী হিসেবেও যথেষ্ট নাম করেছিলেন। সংগীতশিল্পী হওয়ার গভীর আগ্রহ থাকার পরেও কোন এক বিশেষ কারণে কবি মাকিদ হায়দারের সংগীতচর্চা করা হয়নি। বিষয়টি তাঁর জীবনে অধরাই রয়ে গেছে। বহুল প্রচারিত দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে তিনি নিয়মিত কলাম লিখে গেছেন। গড়ে উঠেছিলো তাঁর ‘কলাম মুগ্ধ’ বিশাল এক পাঠকগোষ্ঠী।

শাহবাগের নিয়মিত রেখায়ন আড্ডায় বন্ধু-বৎসল মাকিদ হায়দার ছিলেন সবার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় বড় ভাই। কর্ণধার রাগীব আহসান যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর পর রেখায়নের নিয়মিত আড্ডা বন্ধ হয়ে যায়। তাও প্রায় দুই যুগ হলো। ইদানিং অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগেও ঢাকায় রেখায়ন বন্ধুদের যে কোনো মিলনমেলায় মাকিদ হায়দার ভাইকে পেয়েছি উষ্ণ আন্তরিক উপস্থিতিতে। ধানম-ন্ডি ২৭ নম্বর সড়কে অবস্থিত শ্যাম্পান রেস্টুরেন্টে রেখায়ন বন্ধুদের আড্ডা শেষ হতে প্রায়শই বেশ রাত হয়ে যেতো। মাকিদ ভাই থাকতেন উত্তরায় তাঁর নিজ বাসভবনে। আড্ডা শেষে কীভাবে এত রাতে উত্তরা যাবেন সে বিষয়ে কোনদিন তাঁকে এতোটুকু বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি। জীবনের ঘটমান সব বিষয়কেই তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। বাসায় দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ভোগা একজন কন্যা সন্তান রয়েছেন, যাকে তিনি আগলে রেখেছিলেন পরম ভালোবাসা স্নেহে; এ কথা কারো সঙ্গে এই দীর্ঘ পরিচয়ের জীবনে আমি তাকে শেয়ার করতে দেখিনি।

তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, ঢাকায় বিশাল আয়োজনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ‘ঢাকা লিট ফেস্টে’ তাঁর সঙ্গে বেশ ক’বার দেখা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পাশে বসে অনুষ্ঠান দেখা ও খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকদের কথা শোনার সৌভাগ্য-স্মৃতি এখনও হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। একদিন এমন এক অনুষ্ঠান দেখার বিরতিতে শ্রোতার আসরে পাশের চেয়ারে বসে তিনি লম্বা হাতটি বাড়িয়ে আমার বসে থাকা চেয়ারের উপরের অংশ টেনে অল্প কাছে নিয়ে মুখে হাসি ছড়িয়ে বলেছিলেন, ‘বুঝলা শাকিব, কবিতা যখন লিখতেছো, অনেক পড়বা, ভালো লিখতে গেলে অনেক পড়তে হবে।’ সে কারণেই মনে হয় এখন কবিতা লেখা থেকে পড়াই বেশি হয়।

কুমিল্লার সাহিত্য সংগঠন ‘আমরা জ্যোৎস্নার প্রতিবেশী’র বিভিন্ন সাহিত্য আয়োজনে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণের বেশ ক’বারের আনন্দস্মৃতি এখনো হৃদয়ে প্রাঞ্জল হয়ে রয়েছে। যাওয়ার পথে মাইক্রোবাস থেকে কোথায়ও চা খেতে আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যখন আমরা নেমেছি, রঙ চায়ের কাপ হাতে মাকিদ ভাইয়ের সরব উপস্থিতি সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে সশব্দ হাসিতে। কখনও সফরসঙ্গী খ্যাতিমান প্রয়াত কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী ভাইও মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁর প্রাণ মাতানো গল্প বলায় শরিক হয়েছেন।

তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু ছড়া দিয়ে। গল্প ও নাটক লিখলেও শেষ পর্যন্ত স্বস্তি পেয়েছেন কবিতা লেখায়। সাবলীল ভাষা, নির্মাণশৈলী ও যাপিত জীবনের উপলব্ধির সহজ উপস্থাপন তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মহিমা প্রদান করেছে, জীবনে এনে দিয়েছে খ্যাতি। মাকিদ হায়দারের কবিতায় সারল্য যেনো খেলা করে বিরামহীন। তেমনি একটি কবিতা

‘অদূরের নাগরদোলা’

‘কেন যে সম্মতি দিলাম তার প্রস্তাবে
যেতে হবে সাথে নিয়ে তাকে
দেখবেন তিনি
চৈত্রসংক্রান্তির মেলা।
গিয়ে দেখি শহরের সব লোকজন
উঠে বসে আছে
নাগরদোলায়।’

এমন সহজ করে আপনি কবিতার ভাষায় কথা বলতে পারবেন? পারতেন বলেই তিনি আজও আমাদের মাঝে অনন্য। চলমান জীবন ও সময়ের কাছ থেকে গ্রহণ করা তাঁর কাব্য-উপাদান অতি সহজে পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। দেশপ্রেম, রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্বের সহজ উপস্থিতি তাঁর কবিতাকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধকালে সন্তানকে লেখা একজন মায়ের চিঠি গভীর আবেগে একজন পাঠককে কতদূর নিয়ে যেতে পারে সেটি নিজে পাঠ না করে কেউ বুঝতে পারবে না!

‘জুতা বিষয়ক’

‘বাবা হরিপদ,
চিঠি পাইবামাত্র জুতা কিনিবা,
আমি জানি তোমার পদযুগলে কোন জুতা নাই
জুতা ছাড়া ঢাকা শহরে তুমি চলাফেরা করিতেও পারিবে না।
শুনিলাম জুতার দাম আগের মত নাই
আরো শুনিলাম ঢাকা শহরের
একদল লোক
সারা বছরই
রাস্তায়, খাল-খন্দক কাটিতে পছন্দ করে
তাই ভয় হয় তুমি যদি
সেই খানা-খন্দকে একবার পড়িয়া যাও
তোমাকে ডাঙ্গায় তুলিবার মতো লোকজন
আজকাল
নাই বলিলেই চলে
তাই তোমাকে বলিতেছি তুমি দুই জোড়া
জুতা কিনিবা।
একজোড়া তোমার জন্য
আরেক জোড়া মুক্তিযুদ্ধের নামে।
মুক্তিযুদ্ধ যেন সেই জুতা পায়ে দিয়া তোমার সাথেই
আমাদের দোহার পাড়ার বাড়িতে একবার আসিয়া
বেড়াইয়া যায়।
ইতি, তোমার মা।’

নিরহঙ্কার মিশুক স্বভাবের কবি যাঁর সঙ্গেই মিশেছেন, তাঁকেই আপন করে নিয়েছেন। মানুষ তার জীবন-যাপনে, আচার-ব্যবহারে কতটা সাদামাটা, সহজ সরল হতে পারে তা তিনি নিজের জীবন যাপনে সবাইকে দেখিয়ে গেছেন। অনুজদের তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন, অনায়াসে মিশে যেতেন, কথা বলতেন আন্তরিক মমতায়। অহংকারের কোন বোধ তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। সরলতাই যেন ছিলো তাঁর বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী শক্তি। সরল ও সহজ জীবন-যাপনের মত করেই তিনি সহজ ভাষা শৈলীতে সাজিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার শরীর। তাঁর কবিতা পড়তে বসে মনে হবে আপনার নিজের কথা,জীবনের কথাই তো এমন ছিলো। কবিতার অন্তরে অতি সহজ করে তিনি ইতিহাস-সামাজিকতা-নৈতিকতা এবং সমাজের অবক্ষয়ের কথা বলে গেছেন।

‘যে আমাকে প্রেম শেখালো’

জোৎস্না রাতে ফুলের বনে
সে যেন আজ সুখেই থাকে
সে যেন আজ সুখেই থাকে
সে যেন আজ রানীর মত
ব্যক্তিগত রাজ্যপাটে
পা ছড়িয়ে সবার কাছে
বসতে পারে
বলতে পারে মনের কথা
চোখের তারায়
হাত ইশারায়
যে আমাকে প্রেম শেখালো
প্রেম শিখিয়ে চিনিয়েছিলো
দুষ্ট-গ্রহ অরুন্ধুতী
বৃষ্টি ভেজা চতুর্দশী
জোৎস্না রাতের উজ্জ্বলতা
ভোরের বকুল শুভ্র মালা
নগর নাগর ভদ্র ইতর
রাজার বাড়ি
সেই তো আবার বুঝিয়েছিলো
যাওগো চলে আমায় ছেড়ে
যে আমাকে প্রেম শেখালো
জোৎস্না রাতে ফুলের বনে
সে যেন আজ সুখেই থাকে
যখন তুমি আমায় ডেকে
বললে শুধু
পথের এখন অনেক বাকি
যাও গো শোভন
যাও গো চলে বহুদুরে
কণ্ঠে আমার অনেক তৃষা
যাও গো চলে আপন পথে
এই না বলেই
হাসলে শুধু করুণ ঠোঁটে
বাজলো দূরে শঙ্খ নিনাদ
কাঁদলো আমার বুকের পাথর
কাঁদলো দূরে হাজার তারা
একলা থাকার গভীর রাতে
একলা জাগার তিন প্রহরে
তাইতো বলি সবার কাছে
যে আমাকে দুঃখ দিলো
সে যেন আজ সবার চেয়ে
সুখেই থাকে
যে আমাকে প্রেম শেখালো
প্রেম শিখিয়ে বুকের মাঝে
অনল দিলো
সে যেন আজ সবার চেয়ে
সুখেই থাকে
সুখেই থাকে।

পাঠক হিসেবে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে কবি মাকিদ হায়দার কবিতায় মূলত গল্প বলতে চান। তিনি কবিতায় একটি আলাদা ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

‘চন্দ্রাভিলাষী নারী’ কবিতায় কবি পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করে তিনি বিত্তবান আর বিত্তহীনের জীবনযাপনের অসংগতি বর্ণনা করেছেন সুতীব্র শ্লেষে।

‘পূর্ণিমাতে পূর্ণ হলো
তোমার মনের সাধ
তুমি অথৈ জলে খুঁজেছিলে
পূর্ণিমারই চাঁদ
তুমি বাসতে ভালো জলের খেলা
ভয়াল নদী সাঁঝের বেলা
সেই জলের মাঝে খুঁজতে তুমি
দূর গগনের সাঁঝের তারা
মেঘের ছায়া
নীল সাগরে ভাসিয়ে দিতে
আমার অপরাধ
তুমি অথৈ জলে খুঁজেছিলে
পূর্ণিমারই চাঁদ
আজকে দেখ সবাই যেন
ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে
প্রাণের ভয়ে জলের দিকে
দাঁড়িয়ে আছে গাছের মত
গভীর শোকে স্তব্ধ পায়ে
নিঃস্ব জলের বুকের ভেতর
দাঁড়িয়ে আছে অষ্টপ্রহর
কিন্তু তবু দুঃখ আমার ভিন্নপ্রকার
মুষ্টিমেয় কয়টি লোকে
চালায় গাড়ি জ্বালায় বাতি
দিন দুপুরে ইচ্ছেমত ছিটিয়ে কাঁদা
শখের গাড়ি যাচ্ছে দেখো যাচ্ছে দেখো
রাজার মত নিজের বাড়ি
ছিটিয়ে থুথু
আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি
নিঃস্ব জলের বুকের ভেতর
চতুর্দিকে চোখের নিচে শবের খেলা
কলার পাতে নিজের ছেলে
শুইয়ে দিয়ে ভাবছি শুধু
এবার থেকে তোমার চোখে পড়িয়ে দেব
কোন সে মায়ার ফাঁদ
তুমি অথৈ জলে খুঁজেছিলে
পূর্ণিমারই চাঁদ’।

এই ছিলো তাঁর জীবন দর্শন। পরিণত বয়েসেও এই আপাদমস্তক কবি অফুরন্ত তারুণ্যে ভরপুর জীবনযাপন করেছেন। এমন তারুণ্যভরা প্রাণের খুব কম দেখা মেলে। দেশের কোন তরুণ লেখক বা কবি তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হননি এমনটা পাওয়া যাবে না। যাঁর সঙ্গেই তিনি কথা বলেছেন, মিশেছেন, তাঁকেই আপন করে নিয়েছেন, তাকেই আপ্লুত করতে পেরেছেন। তাদের উপর দারুণভাবে বিস্তারিত হয়েছে তাঁর কাব্যিক প্রভাব। তরুণদের তিনি ‘তুই’ করে সম্বোধন করতেন। মানুষকে ভালোবেসে আলিঙ্গন করার সৎ সাহস ছিল তাঁর সব সময়। *[চলবে]*

পাবনার আরিফপুরের হায়দার বাড়ি

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

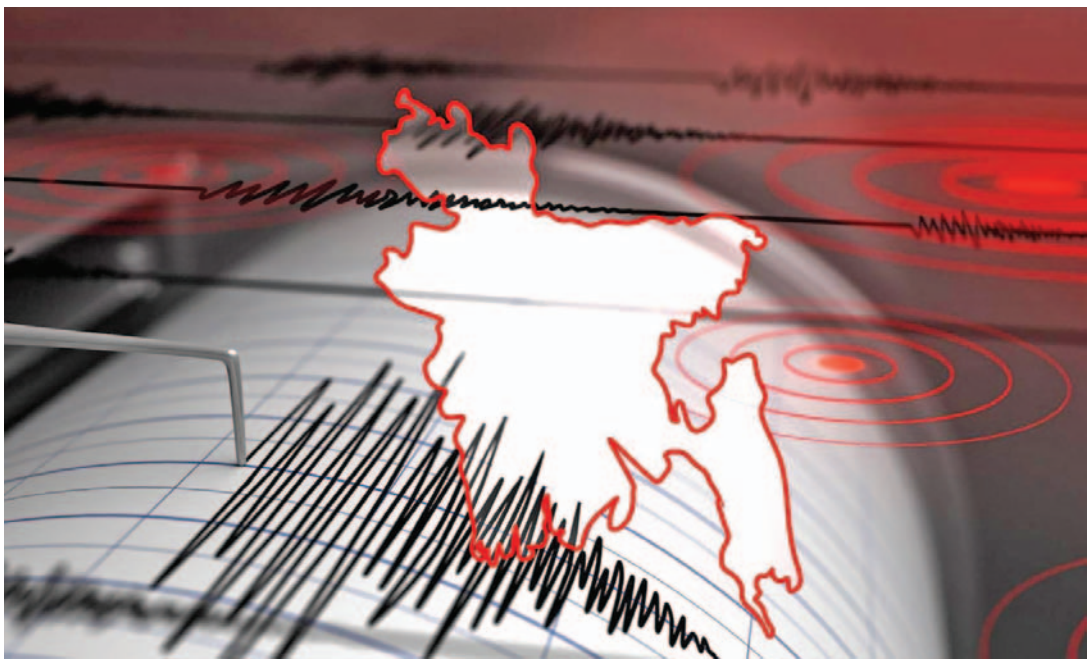

ভূমিকম্প নিয়ে যা জানা জরুরি এবং আত্মরক্ষার জন্য করণীয়

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশে ছোট-বড় আরও ভূমিকম্পের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় সবাইকে বেশকিছু বিষয় সম্পর্কে সচেতন এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি থাকা জরুরি। এই আলোকে বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা কিছু বিষয় এখানে সারসংক্ষেপ আকারে তুলে ধরা হলো-

এ অঞ্চলে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৭.৬ মাত্রার কাছাড় ভূমিকম্প, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৭.১ মাত্রার বেঙ্গল ভূমিকম্প, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৮.১ মাত্রার 'গ্রেট ইন্ডিয়ান' ভূমিকম্প এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ৭.৬ মাত্রার শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্পের মতো বড় দুর্যোগের ইতিহাস রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ৭ মাত্রার ভূমিকম্প ১০০ থেকে ১২৫ বছর পরপর এবং ৮ মাত্রার ভূমিকম্প ২৫০ থেকে ৩০০ বছর পরপর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও একশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে বড় কোন ভূমিকম্প হয়নি। এখন সেই বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস এসেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় ভূমিকম্প হওয়ার আগে সংকেত হিসেবে যে ভূকিম্প হয় সেটিকে 'ফোরশক' বলা যায়। তাঁদের মতে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর আমাদের দেশে বড় ভূমিকম্প না হওয়ায় এখন সেই ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

ভূমিকম্প বিষয়ক তথ্য বলছে, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতি বছর ১০ হাজারেরও বেশি ভূমিকম্প হয়। তবে, এগুলোর বেশিরভাগই বোঝা যায় না। মাত্র কয়েকশ' ভূমিকম্পই কেবল বোঝা যায়, যেগুলোর মাত্রা ৩ এর বেশি। আর বোঝা যাওয়া ৪ মাত্রার বেশি ভূমিকম্পের সংখ্যা মাত্র ১৫-২০টি। এ পর্যন্ত রেকর্ডকৃত সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রাল চীনে। এতে আনুমাণিক ৮৩০ হাজার (আট লক্ষ ত্রিশ হাজার) লোক মারা যান। এছাড়া, ১৯৭৬ সালে চীনের ট্যাংশানে ভূমিকম্পে মারা যান ২৫০ হাজারেরও বেশি (আড়াই লাখেরও বেশি) লোক।

এ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে চিলিতে। ২২ মে ১৯৬০-এর এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৫। আর, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয় ২৮ মার্চ ১৯৬৪ তারিখে। আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ডে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৯ দশমিক ২। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে বলছে, প্রত্যেক বছর গড়ে ১৭টি বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়, যার রিখটার স্কেলে মাত্রা সাতের উপরে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বছরে লাখ লাখ ভূমিকম্প হয়। এর অনেকগুলো হয়তো বোঝাই যায় না। কারণ, এগুলো খুব প্রত্যন্ত এলাকায় হয়, অথবা সেগুলোর মাত্রা থাকে খুবই কম। পৃথিবীতে যতো ভূমিকম্প হয় তার অধিকাংশ, অর্থাৎ ৯০ শতাংশই হয় রিং অফ ফায়ার এলাকাজুড়ে। এই এলাকাটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।

ভূমিম্পের কারণে প্রাকৃতিকভাবে যা হয় : ভূমিকম্পের কারণে দিনের দৈর্ঘ্য কমবেশি হতে পারে। যেমন জাপানের উত্তর-পূবে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল, যার মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৯। এর ফলে পরিবর্তন ঘটে পৃথিবীর ভরের বণ্টনে। তার প্রভাবে পৃথিবী ঘুরতে থাকে সামান্য দ্রুত গতিতে, আর তখন দিনের দৈর্ঘ্য কমে যায়। সেদিন দিনটি ১.৮ মাইক্রো সেকেন্ড ছোট ছিলো।

ভূমিকম্পের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহর প্রত্যেক বছর গড়ে দুই ইঞ্চি করে লস অ্যাঞ্জেলসের দিকে সরে যাচ্ছে। এই গতিতে চলতে থাকলে এই দুটো শহর কয়েক লাখ বছর পর একত্রিত হয়ে যাবে। ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ বলছে, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইটালিতে এক ভূমিকম্পের সময় এক ধরনের ব্যাঙ সেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো এবং ফিরে এসেছিলো ভূমিকম্পের পরে। বলা হয়, এই ব্যাঙ পানির রাসায়নিক পরিবর্তন খুব দ্রুত শনাক্ত করতে পারে।

২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি বড় ধরনের এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিলো চিলির কনসেপসিওন শহরে। রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিলো ৮.৮। এর ফলে পৃথিবীর শক্ত উপরিভাগে ফাটল ধরে এবং শহরটি ১০ ফুট পশ্চিমে সরে যায়।

নেপালে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল আঘাত হানে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কমে আসে হিমালয়ের অনেক পর্বতের উচ্চতা। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা কমে গিয়েছিল এক ইঞ্চির মতো।

প্রাকৃতিক লক্ষণ : ভূমিকম্পের আগে স্থির পানি থেকে গন্ধ বের হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূমিকম্পের আগে পুকুর, খাল-বিল,হ্রদ, জলাশয়ের স্থির পানি থেকে দুর্গন্ধ আসতে পারে। এমনকি সেই পানি সামান্য উষ্ণও হয়ে উঠতে পারে। কারণ, প্লেট সরে যাওয়ার কারণে মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তারজন্য এটা হয়ে থাকে। এর ফলে ওই এলাকার বন্যপ্রাণীর আচরণেও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে শুধু ব্যাঙের আচরণে পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই-ই নয়। যেমন ইন্দোনেশিয়া এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সুনামির আগে প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেক পশু-পাখিকে দেখেছেন উঁচু এলাকার দিকে ছুটে যেতে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট কম্পন পশুপাখিরা টের পেয়ে যায়।

ভূমিকম্পের পরে পুকুরে কিম্বা সুইমিং পুলের পানিতে কখনও কখনও ঢেউ দেখা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূমিকম্প হয়তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও কয়েক ঘণ্টা ধরে অভ্যন্তরীণ এই পানিতে তরঙ্গ অব্যাহত থাকতে পারে।

কেন হয় ভূমিকম্প : ভূগর্ভস্থ প্লেট সরে যাওয়ার কারণ ছাড়া আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার ফলেও ভূমিকম্প হতে পারে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা বের হবার ফলে ভূমিতে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় সেটা এত তীব্র নাও হতে পারে। এছাড়া ভূ-ভাগের অভ্যন্তরের কোন দুর্ঘটনা থেকেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

ভূ-অভ্যন্তরের আন্দোলন ছাড়াও নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণভাবে যদি কোন নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তাহলে ভূ-ভাগ কেঁপে ওঠে। আবার এই বিস্ফোরণটা যখন ঘটানো হয় মাটির নিচে, তখন মাটির কেঁপে উঠার পরিমাণ যায় বেড়ে। নিউক্লিয়ার

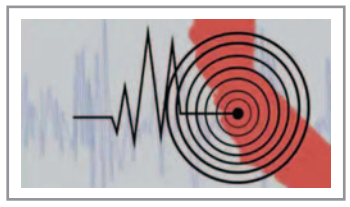

বোমা বিস্ফোরণের ফলে তা থেকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয় এবং তা বাতাসে মিশে বিশাল হুমকির সৃষ্টি করে। একটি বোমা কি পরিমাণ ধ্বংসক্ষমতা সম্পন্ন, তা পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র নিউক্লীয় বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে। কারণ মাটির নিচে এটা করা হলে বায়ুমন্ডল তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পায়।

পাশাপাশি বড় আকারের কোন গ্রহাণুর পতনের ফলেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একেকটি বড় আকারের গ্রহাণু কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার বোমার সমান শক্তি নিয়ে আঘাত হানতে পারে। এমন একটা গ্রহাণুর আঘাতেই ধ্বংস হয়েছিল প্রাচীন ডায়নোসরের সভ্যতা।

আশঙ্কা : বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ইন্ডিয়ান ও ইউরোশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলে এর অবস্থান। আমাদের এখানে আসাম ফল্ট, ডাউকি ফল্ট ও উত্তর-পূর্বে মিয়ানমারের সেগাইং ফল্টের মতো চ্যুতি রয়েছে। এ কারণে আমাদের এখানে বিভিন্ন সময় কম-বেশি ভূমিকম্প হচ্ছে এবং সামনে আরও হবার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে ভূগর্ভ বিষয়ে সর্বশেষ এক গবেষণা তথ্যে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জামালপুর ও ময়মনসিংহ থেকে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত ৪০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ফাটল (ফল্টলাইন) রেখার সন্ধান মিলেছে। এই ফাটল সর্বোচ্চ ৬ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে। এর আগে থেকে যে ফাটলরেখার তথ্য রয়েছে তা হল, ডাউকি ফাটলরেখা এবং ইন্দোবার্মা মেগাথ্রাস্ট ফাটলরেখা। এ দুটোর সঙ্গে যোগ হল নতুন এই ফাটলরেখা।

যেভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হবে : ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। তাই আত্মরক্ষার জন্য সচেতন ও প্রস্তুতি থাকা অত্যন্ত জরুরি। যেমন, ১. ভূমিকম্পের সময় বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে নিতে হবে এবং টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোনো আসবাবপত্রের নীচে আশ্রয় নিতে হবে। যার নীচে আশ্রয় নেওয়া হবে তা এমনভাবে ধরে থাকতে হবে, যাতে সেটি মাথার ওপর থেকে সরে না যায়। এ সময় শক্ত দরজার চৌকাঠের নীচে অথবা পিলারের পাশে আশ্রয় নেয়া উত্তম। রান্নাঘরে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বের হয়ে আসতে হবে। ভবন ধসে প্রাণহানি এড়াতে মজবুত কাঠামোর মধ্যে 'ড্রপ, কভার এবং হোল্ড অননীতি' অনুসরণ করা উচিত, অর্থাৎ হাঁটু গেড়ে বসে, একটি মজবুত টেবিল বা ডেস্কের নিচে আশ্রয় নিয়ে এটি শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। যদি কোনো আশ্রয়ই না থাকে, তবে একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে এবং মাথা ও ঘাড় হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এতে জানালা, কাঁচ, আয়না এবং ভারী আসবাবপত্র ছিটকে আসা থেকে বা এসবের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ২. দ্রুত বাড়ির বিদ্যুতের মূল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং গ্যাসের চাবি বন্ধ রাখতে হবে। ৩. উঁচু বাড়ির জানালা, বারান্দা বা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা বোকামি। এ সময় লিফট ব্যবহার করা বিপজ্জনক। ঘরের বাইরে থাকলে গাছ, উঁচু বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে খোলাস্থানে আশ্রয় নিতে হবে। ৪. জনাকীর্ণ ঘর যেমন- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, সিনেমা হল, মার্কেটে থাকলে বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভিড় করা উচিত নয়। ৫. খোলা জায়গায় থাকলে বিদ্যুতের তার, গাছ এবং উঁচু ভবন থেকে দূরে থাকা উচিত। ৬. গাড়িতে থাকলে সেটি থামিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে হবে। গাড়িকে কোন বিল্ডিং বা বিদ্যুত তারের নিচে পার্ক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামাতে হবে। ভূকম্পন না থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরেই অবস্থান করতে হবে। ৭. ভূমিকম্পের ফলে ভাঙা দেয়ালের নীচে চাপা পড়লে বেশি নড়াচড়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। এ সময় কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হবে, যাতে ধুলোবালি শ্বাসনালিতে না ঢোকে। সম্ভব হলে দেয়ালের পাশে সরে আসতে হবে এবং উদ্ধারকারীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে। শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, এ সময় যাতে শ্বাসযন্ত্রে ধুলোবালি প্রবেশ না করে। ৮. ভূমিকম্প পরবর্তী আহতদের সাহায্য করা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয় ফোন কল এড়িয়ে চলা জরুরি। কারণ এসময় নেটওয়ার্ক জ্যাম হতে পারে। ৯. ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোর কাছাকাছি যাওয়া উচিত হবে না, কারণ এটি আরও ভেঙে পড়তে পারে। ১০. আগাম সতর্কতা হিসেবে বাড়ি বা বাসার ঝুঁকিপূর্ণ জিনিসপত্র ও আসাবাবপত্র দেয়ালে দড়ি দিয়ে বেধে রাখা ভাল। তাহলে এগুলো ছিটকে গিয়ে দুর্ঘটনা বাড়াতে পারবে না। ১১. কাছে সব সময় ফায়ার স্টেশন, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টেলিফোন নম্বর রাখা উচিত। ১২. আত্মরক্ষার জন্য ঘরে একটি ব্যাগে রেডিও, টর্চ লাইট, হাতুড়ি, হেলমেট, কুড়াল ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসমূহ মজুদ রাখা জরুরি। ১৩. সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, ভূমিকম্প শুরু হলে ভয় পরিহার করে শান্ত থেকে সবকিছু করতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করা বা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ ভূমিকম্প সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ সেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং তা বুঝে উঠতেই ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় চলে যায়। তাই ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে দৌড়ে বের হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ১৪. এ সকল বিষয় ছাড়াও ভূমিকম্প পরবর্তীতে করণীয় কিছু বিষয় রয়েছে। কারণ সাধারণত একবার ভূমিকম্প হলে পরপর কয়েকটি কম্পনের ঘটনা ঘটে থাকে। ভূমিকম্প পরবর্তী করণীয়সমূহ হলো- প্রথমবার অনুভূত কম্পন থেমে যাওয়ার পর ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নেওয়া; বৈদ্যুতিক বা টেলিফোনের খুঁটি ও তার, উঁচু দেয়াল ও ভবন থেকে দূরে থাকা; গ্যাস বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ পেলে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া; জরুরি তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভব হলে রেডিওসেট ব্যবহার করা উচিত। ১৫. সাহায্য করার ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

পরামর্শ : ভূমিকম্পের সময় কেউ যদি ঘরের ভেতরে থাকেন, তাহলে তিনি ঘরের বিম বা কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিতে পারেন। এ সময় ঘরের কাচ, জানালা কিংবা দেয়ালের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর যদি বিছানায় থাকা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলতে হবে। ভূমিকম্পের সময় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও অগ্নিকান্ড বেশি ঘটতে পারে, তাই এ সময় নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আগে ঘরের মেইন সুইচ ও গ্যাসের চুলা বন্ধ করে যেতে হবে। যদি বহুতল বাড়ির ওপরের দিকের কোন তলায় আটকা পড়া হয় এবং বেরিয়ে আসার কোন পথই যদি না থাকে- তবে সাহস না হারিয়ে ধৈর্য্য ধরে উদ্ধারকারীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ভূমিকম্পের সময় অফিসে থাকলে লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি দিয়ে নামা ভালো। এ সময় হুড়োহুড়ি না করে মাথা ঠান্ডা রেখে যতো দ্রুত সম্ভব নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে। ভূমিকম্পের সময় হুইলচেয়ারে বসা থাকলে চেয়ারটি লক করে রাখতে হবে। ঘাড় ও মাথায় যেন কোন ভারী জিনিস না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ভূমিকম্পের সময় স্কুলে থাকলে ডেস্ক ও টেবিলের নিচে ঢুকে পড়তে হবে এবং তা শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। বড় ভূমিকম্পের পরপরই আরেকটা ছোট ভূমিকম্প হতে পারে, সেটাকে বলে আফটার শক। এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। একবার বড় ভূমিকম্প হলে পরের কয়েক রাত সতর্ক থাকতে হবে। এ সময় রাতে ঘুমানোর আগে মাথার কাছে একটা কাঁথা রাখতে হবে, যাতে সময়মতো মাথাটাকে রক্ষা করা যায়।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

শীত
উষ্ণতা অন্বেষণের ঋতু

মোসতাফা সতেজ

আগামী পরশু ১ পৌষ। শীত কালের শুরু। শীতের আমেজ শুরু হয়েছে তার আগে থেকেই। হেমন্তের হাওয়ায় বদলে যায় ঋতু। এ ঋতুতে গ্রীষ্মের আগুন ঝরা তাপ ও আদ্রতা সহ্য করতে হয় না। বর্ষাকালের মতো স্যাঁতস্যাঁতে ভাব, কাদা পানির রাস্তা আর লাগাতার বৃষ্টিতে ভোগান্তির ব্যাপার নেই। শীতকাল তাই অনেকেরই ভাল লাগে। আগে উত্তুরে হিমেল হাওয়ায় গা কাঁপানো শীত নামতো। কিন্তু বাড়ি গাড়ি আর জনমনুষ্যের সংখ্যা যত ভারী হচ্ছে ততই কমছে শীতের দাপট। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে প্রকৃতি। শীতকালও আমাদের ভরসা দেয়। উষ্ণতা অন্বেষণের ঋতু শীত। সকল প্রাণীই উষ্ণতা খোঁজে। একালে কাঁঠাল কোরকে টলটল করে হিমবিন্দু। কাঁঠাল গাছে উঁকি মারে কোঁড়। কুয়াশা রেণুর মধ্যে এই শীতেই ডোঙার মতো ঢাকনা ফেটে বেরিয়ে পড়ে কচি কাঁঠাল। আকাশমুখি থাকার পর ধীরে ধীরে নুয়ে পড়বে কলি। ছয়টি ঋতুর মধ্যে শীত হলো সমৃদ্ধির কাল। সমাজে, জীবনে, প্রগতিতে শীতের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। পৌষের প্রথম পক্ষের ছোটো ছোটো দিনগুলোও দ্রুত ফুরিয়ে যায়। এ মাসে ফসল ঘরে তোলার উৎসব হয়ে থাকে। বছর বছর এ উৎসব আমেজ ফিকে হয়ে আসছে। পৌষ এলে অনেক এলাকাতেই শিশু-কিশোরেরা নাটক মঞ্চায়ন করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতো। যাত্রা আর সার্কাসেরও তাঁবু বসে যেত গ্রামে গ্রামে। হিড়িক পড়তো লোকজ বিনোদনের। সে ধারা এখন বিলুপ্ত হতে বসেছে নানা কারণে। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির দেড় দশক পরেও গ্রামীণ পরিবারে ঢেঁকির আওয়াজ পাওয়া যেত। ধূম পড়ে যেত পিঠে খাওয়ার। এখন তা সীমিত হয়ে আসছে। একান্নবর্তী পরিবার তখন স্বাভাবিক ছিল। বাড়ির কর্তারা রোজগারের উপায় অবলম্বন করতেন একই ধরনের রোজগারের মাধ্যমে। তাই সমাজ সংসারে লেগেই থাকত উৎসব। কিন্তু এখন একটি পরিবার ভেঙে অসংখ্য পরিবারে পরিণত। ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষ বাড়ছে। তাই হারিয়ে যাচ্ছে পিঠে খাওয়ার আনন্দ। জীবন এখন ফাস্ট ফুডের দোকান নির্ভর। এ প্রজন্মের শহুরে শিশুরা পাঠ্য পুস্তকে পিঠে পুলির নাম জানতে পারে। কিন্তু সবাই স্বাদ পায় না। পৌষ আসতে না আসতেই বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা পায় লম্বা ছুটি। পুরো ডিসেম্বর অফুরন্ত সময়। এ সময় যারা গ্রামে আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যায় তারা খেজুরের রস আর পিঠে খাওয়ার স্বাদ নিয়ে ঘরে ফেরে। তাদের কাছে বলগাহীন আনন্দে ভেসে যাওয়ার উপযুক্ত সময়ই শীতকাল। ধানকাটা মাঠে ডাঙ্গুলি, কাবাডি, কিংবা ব্যাট বল ও ব্যাডমিন্টন নিয়ে কেটে যায় শীতের দিনগুলি। নরম রোদ আর ফিকে সবুজ মাঠ হলো ক্রিকেটের অনুষঙ্গ। সাহেবিয়ানার ঘ্রাণ এর প্রতিটি বিভাগে ছড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা রাতে পাড়ায় পাড়ায় আগের মতো ব্যাডমিন্টন খেলার চলও কমে গেছে। ফ্ল্যাড আলোর ঝরনা তলায় শূন্যে তেমন নাচে না প-াস্টিকের ফেদার। শহুরে পুষ্পমেলা আর পিঠে উৎসব তো স্নেহপটু মায়ের কথা মনে করে দেয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধববলয়ে স্নেহ মমতার বাঁধন গুলো স্বার্থের স্রোতে ক্রমশ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হচ্ছে প্রতিদিন। এর মধ্যেই চলছে ক্রিকেট বন্দনা। একালে তাপমাত্রা বেশ নেমে আসে বলে দিনে রোদ রাতে উম বেশ উপভোগ্য। শীতের শীর্নতোয়া নদীর মতো কাতর হয়ে পড়ে গরিব মানুষের শরীর। কংকালসার মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে সাত সকালে গায়ে এক ফালি 'ত্যানা' জড়িয়ে শ্রম বিক্রির আশায় বাজারে গিয়ে বসে। শ্রম বিকোয়। আবহামান বাঙালি ক্ষেত নির্ভর। এখনও তাই। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যতই সভ্যতার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে ততই দুঃখজনক ঘটনা বাড়ছে। দুষিত হচ্ছে পরিবেশ। শীতাক্রান্ড় মানুষের আত্মপরিচয় সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যে মিশে রয়েছে। সংবাদ সাহিত্যে শীতার্তদের কথা খবর জীবীদের একটি প্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে। অসহায় পরিবারের মধ্যে সরকারিভাবে দলীয়ভাবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে শুরু হয় শীতবস্ত্র বিতরণ। তাদের পশমী পোশাক দিয়ে, কম্বল দিয়ে উমবদ্ধ জীবনে আনন্দের অনুভব এনে দেন তারা। ঠান্ডায় জমে যাওয়া নিম্নবিত্ত মানুষ একটু গরমের জন্যে ভোর বেলা শীতল বিছানা ছেড়ে খড় কুটো জ্বালিয়ে আগুন জ্বালায়। রাতে তারা শীত কষ্টে ঘুমাতে পারে না। গোটা রাত তারা ছেঁড়া কাঁথার নিচে কুন্ডলি পাকিয়ে থাকে। লাগাতার মা-বোনদেরও শৈত্য প্রবাহে জুবুথুবু অবস্থা হয়। এ সময় ঋতু কেবল হাড় কাঁপানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক পাঁচালি। গা কাঁপানো শীতে পশুর ক্লিষ্ট জীবনের মতো কিছু দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষেরা আজো জ্বলে উঠতে পারছে না নিয়মিত রোজগারের পথ অভাবে। ঠান্ডায় রোগে শোকে দুর্বল হতে হতে ওরা অনুভব করে শীত শীতের।

আনন্দ ও শোক নিয়েই শীতকাল। কেবল রোমঞ্চকর কক্ষপথ ঘুরে টিকে আছে পিকনিকের মজা ও হুল্লোড়। প্রবাসী পাখিরা এদেশে বিলাঞ্চলে খাবার আশায় আশ্রয় নেয়। তাই দেশে সুযোগ খোঁজে শিকারী দল। ভোর রাতে তারা বন্দুক নিয়ে হানা দেয় বিলে। কাঁচা রোদে নির্ভুল নিশানায় কার্তুজ ফেটে বারুদের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। বিলের পানিতে ঝিলিক দেয় বুনোহাঁসের রক্তস্রোত। জিজ্ঞাসা জাগে, এ দৃশ্য আর কত দিন ?

পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবোধ ও স্বাস্থ্যবোধ সম্পর্কে যারা উদাসীন নয় তারাই শীতকালে সুস্থ থাকে। তারপরেও শীতে বড় বড় শহরের বায়ুমন্ডল ধুলো আর ধোঁয়ার ভরে যায়। সন্ধ্যার দিকে শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে ওঠে কষ্টকর। শীত একটু বেশি পড়লে ঢাকাবাসীর ভারী আহলাদ হয়। শীতকালে লেখা-পড়ার চাপ কম থাকে বলে অনেকে শিক্ষা সফরে বেরিয়ে পড়ে। জমে ওঠে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বক্সবাজার, কুয়াকাটা সুন্দরবন, এলাকা। বাদ যায় না নাটোর-পাকশী-দিনাজপুর। আমাদের দেশে এ ঋতুতে অনেক অতিথি পাখি আসে হিমালয়ের ওপাশ থেকে। কিছু আসে সাইবেরিয়া থেকে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে কিছু পাখি এদেশে যাত্রা বিরতি করে আবার রওয়ানা দেয়। নদীর মোহনা, চরাঞ্চল, বিল, হাওর, বাওড়, দীঘিতে কাদাখোচা, চাপাখিসহ নানা রকম পাখি দেখা যায়। চিড়িয়াখানা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্রদে অতিথি পাখি দেখার জন্যে একালে বেশ ভীড় জমে। শীতের পিঠা বিখ্যাত হয়ে আছে প্রায় প্রতিটি পরিবারে। এই উপাদেয় খাবারে শিশুদের আবদার বেশি। পিঠার আকার আকৃতি-স্বাদ বিচিত্র। সারা বছর পিঠা তৈরি করা হলেও শীতের পিঠার স্বাদ বেশি। কারণ খেজুরের রস ও পাটালি গুড়। এই পিঠা আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর পাশাপাশি শীতকে প্রতিনিয়ত উপভোগ্য করে তোলে নরম রোদ আর শাক সবজি। শালগম, টমেটো, ওলকপি, লেটুস, লাউ, আখ প্রভৃতি। সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী শীত নিদ্রায় চলে যায়। কুনো ব্যাঙ আশ্রয় নেয় ঘরকোণে। শীত নিদ্রায় যাওয়ার আগে এ সকল প্রাণী বেশি বেশি খাবার খেয়ে শরীরে চর্বি বাড়িয়ে নেয়। নিদ্রায় থাকাকালে সঞ্চিত চর্বি ফুরিয়ে গেলে তাদের শীত ঘুম ভেঙে যায়। বেড়িয়ে পড়ে খাবারের খোঁজে। সজিনা ফুলও ফুটে যাবে। ক্ষেত জুড়ে হেসে উঠবে মটরফুলের বেগুনি পাপড়ি। দিগন্ত জুড়ে ফুটে গেছে সরিষা ফুল। বাগানে বাগানে আর ছাদের টবে ফুটবে শীতের নানা রকম ফুল। দেশি ফুলের মধ্যে কৃষ্ণকলি, আকাশনিম, দশবাইচন্ডি, গাঁদা, সূর্যমুখি, অশোক, পারিজাত, জারুল, শিমুল, মাখনা, প্রভৃতি। এছাড়া বিদেশি ফুলের মধ্যে ডালিয়া, পিটুনিয়া, জিনিয়া, বাটন, কারনেশন, কসমস, লিলি ও পপি। এ সময় বাগান আর টবের চেয়ে বেশি ফুল ফোটে বনে জঙ্গলে।

আশা পূরণ কতো দূর

প্রথম পৃষ্ঠার পর : মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

এ সময় তিনি বলেন, 'এই নৌবন্দরের মাধ্যমে পণ্য খালাসের গতি ১০ গুণ বাড়বে। আরও বাড়বে রাজস্ব আয়, কর্মসংস্থান। এতে ব্যাপকভাবে উন্নীত হবে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থ সামাজিক চিত্র।' এসময় উপদেষ্টা চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি ব্যবস্থাপনায় দেওয়ার কথা বললেও এই নৌবন্দর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, উত্তরাঞ্চলে কম খরচে সহজে নদীপথে বিপুল পরিমাণ সার, কয়লা, সিমেন্ট, পাথরসহ অন্যান্য পণ্য পাবনার নগরবাড়ি নৌবন্দর দিয়ে আনা-নেওয়া করা হয়। এ কারণে নৌপথে পণ্য পরিবহনের সুবিধা বাড়াতে নগরবাড়িতে দেশের সবচেয়ে আধুনিক নদীবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ৫৬৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরে ৩৬ একর জায়গার ওপর ২০১৮ সালে বেড়া উপজেলার নগরবাড়ী ঘাটে যমুনা নদীপাড়ে শুরু হয়েছিল নির্মাণ কাজ। অবশেষে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত এই নৌবন্দরে তৈরি হয়েছে ৩৬০ মিটার কংক্রিটের জেটি, টার্মিনাল, ওয়ারহাউস, গোডাউন, বাফার গোডাউন, ওপেন শেড, ওপেন স্টেজসহ দ্রুততম সময়ে পণ্য লোড-আনলোডের সব সুব্যবস্থা। আগে যেখানে প্রতিদিন মালপত্র খালাস করা হতো গড়ে ২ হাজার টন, এখন সেখানে পণ্য খালাস করা যাবে অন্তত ২০ হাজার টন।

এই নদী বন্দর উদ্বোধনের সময় উপদেষ্টা ড. এম সাখাওয়াত হোসেন উল্লেখ করেছিলেন, 'নগরবাড়ি নদী বন্দর পরিচালনায় থাকবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবস্থাপনায় যা যন্ত্রপাতি দরকার তা সেই প্রতিষ্ঠানই দেবে। আমরা চারটি নতুন ড্রেজার পেয়েছি। নদীপথ সচল রাখতে সেগুলো কাজ করছে।' তিনি এও বলেছিলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি চট্টগ্রাম থেকে, মংলা বন্দর থেকে কিছু কিছু জায়গায় কন্টেইনার সরাসরি পৌঁছে দিতে। অতীতে নদীপথ ছিল চলাচলের একমাত্র পথ। আমরা পরিকল্পনা করেছি পানগাঁওকে মেইন টার্মিনাল করে, নগরবাড়ির মতো টার্মিনালে ছোট ছোট লাইটারেজ জাহাজ দিয়ে আমরা কন্টেইনার নিয়ে আসবো এবং নিয়ে যাবো। এ জন্য আমরা খুব শিগগির টেন্ডার করবো।' উপদেষ্টা এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, নগরবাড়ি নৌবন্দর শুধু পাবনা বা দেশের উত্তরাঞ্চলেরই নয়, রাজধানীসহ গোটা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে নজীর সৃষ্টি করবে এবং এ কারণে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে- তাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সুচনা হবে।

এই আশাবাদের ব্যাপারে ওয়াকেবহাল এবং পর্যবেক্ষক মহল বলছেন, নগরবাড়ি নৌবন্দরটি আগে থেকে চালু থাকলেও এটিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় উন্নীত করে উদ্বোধন করা হয়েছে মাত্র এক মাস ৬দিন আগে। এখনও সব আশাবাদই 'আশা করা'র পর্যায়ে রয়েছে। এমনকি এ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি কোন্ বেসরকারি সংস্থা বন্দরটি পরিচালনা করবে? এটি চূড়ান্ত হওয়ার পর থাকবে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার মত অনেক কাজ। থাকবে নানান ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সন্তুষ্টি তৈরির কাজও। সবচেয়ে বড় সমস্যার বিষয় হবে, সারা বছর বন্দর চালু রাখা বা স্বাভাবিক রাখার চ্যালেঞ্জ সামলানো। কারণ শুষ্ক মৌসুমে নদীতে নাব্য সমস্যার কারণে জাহাজ তো চলতেই পারে না, ফেরী-লঞ্চ চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পণ্য খালাস ও লোড-আনলোডের যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে- তা রীতিমত চ্যালেঞ্জের। এখানে শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্য ধরে রাখাটাই প্রধান সমস্যা। এর বাইরেও রয়েছে ছোট-বড় নানান সমস্যা। যা দীর্ঘদিন ধরে চলমান, এর কোন সমাধান বের করা সম্ভব হয়নি। এ রকম বহু সমস্যায় ভুক্তভোগী আশপাশের অন্যান্য নদীবন্দরগুলোও। যেমন নিকটবর্তী বাঘাবাড়ি নৌবন্দর বড় রকমের হুমকির মুখে রয়েছে। শুকনো মৌসুমে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও বড়াল নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে কমে ডুবোচর জেগে উঠে নৌচলাচলকে অসম্ভব করে তোলে। নাব্য সংকটের কারণে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে আসা জাহাজগুলো বাঘাবাড়ি বন্দরে আসতে পারে না। যার ফলে বন্দরটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। একইভাবে ঈশ্বরদীর রূপপুর নৌবন্দরটি কখন লক্ষ্যে পৌঁছাবে, তা নির্ভর করছে- পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার পর এর বাণিজ্যিক কার্যকারিতা এবং সংশ্লিষ্ট পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়নের উপর। এছাড়া পদ্মাতীরের নাজিরগঞ্জ নৌবন্দরটির সাফল্যও ঝুলে আছে নদী ভাঙন এবং ফেরি চলাচল ব্যাহত হওয়ার ঘটনায়। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের চিলমারী নৌবন্দরও ব্যর্থ অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। রংপুরের রৌমারী-রাজিবপুর নদীবন্দরও চিলমারীসহ নদীর পশ্চিম পাড়ের এলাকাগুলোতে তীব্র নদী ভাঙনের মুখে হুমকিতে আছে। এমন বাস্তবতায় নতুন বন্দর হিসেবে নগরবাড়ি নৌবন্দরের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপদেষ্টা যদিও বলেছেন, 'আমরা চারটি নতুন ড্রেজার পেয়েছি। নদীপথ সচল রাখতে সেগুলো কাজ করছে।' তার এই আশাবাদ কতোখানি আলোর মুখ দেখাবে, এবং চারটি ড্রেজারই শুষ্ক মৌসুমে যথেষ্ট কিনা- তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এক কথায় সব সমস্যার সমাধান করতে পারলেই কেবল আশার ক্ষেত্রে আলো জ্বলবে। তাই নগরবাড়ির এই সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আধুনিক নৌবন্দর কতোদিনে সেই আশা পূরণ করতে পারবে- তা কেবল সময়ই বলতে পারে।

দেড় লক্ষাধিক বস্তা শামুক নিধন

শেষের পৃষ্ঠার পর : হয়। জুলাই থেকে অক্টোবর চার মাস ধরে চলে এ সংগ্রহের কাজ। তবে এবার বর্ষার পানি দেরিতে নামায় আরও একমাস চলেছে শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ। গত বছরের এ সময়ে অন্তত ৫ থেকে ৬ কোটি টাকার শামুক সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবার এই সংগ্রহের পরিমান ছিল আরও বেশি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মহাজনের পাশাপাশি পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৫০০ ফরিয়া ব্যবসায়ী এই কারবারে কাজ করেছেন। ফরিয়াদের অধীনে শামুক সংগ্রহকারীর সংখ্যা ছিল অন্তত ২০ হাজার। তথ্যানুযায়ী, পাঁচ মাসে অন্তত দেড় লাখের বেশি বস্তা শামুক ধরে কারবার করা হয়। প্রতি সংগ্রহকারী প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত গড়ে তিন থেকে চার বস্তা শামুক সংগ্রহ করেছেন। প্রতি বস্তা শামুক বিক্রি হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ শামুক কিনে খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের মাছের খামারগুলোয় বিক্রি করেছেন। সূত্র মতে, এক চলনবিলেই প্রতি বছর দেড় কোটি টাকার শামুক বিক্রি হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, গত পাঁচ মাসে প্রতিদিন ৭০-৮০টি ট্রাকে করে পাবনার শামুক বিভিন্ন জেলায় চলে গেছে। স্থানীয় খামারিদের চাহিদা মিটিয়ে খুলনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, বরিশাল, বাগেরহাট, যশোরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পশু-পাখি খামারিদের কাছে এ শামুক ও ঝিনুক পৌঁছানো হয়।

প্রসঙ্গত, কারবারীরা এই শামুক পশু-পাখির স্বাস্থ্যকর ও টাটকা খাবার হিসেবে বিক্রি করে থাকেন। তবে এই শামুক ও ঝিনুক কৃষি জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এবং শামুকের খোলশ ক্যালশিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শামুক জলাশয়ের নোংরা পানির পোকামাকড় আহার করে পানি বিশুদ্ধকরণের কাজ করে। স্থানীয় মিঠা পানির মাছের খাদ্যের চাহিদাও পূরণ করে শামুক। এভাবে শামুক জীব বৈচিত্র বাঁচিয়ে রাখে। এক কথায় শামুক এবং ঝিনুক প্রাণ ও পরিবেশের নীরব বন্ধু।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, অবাধে শামুক ও ঝিনুক নিধনের ফলে প্রাণ ও পরিবেশে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসছে। জলাশয়ের মাছ, মাটি ও পানিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সূত্র মতে, এভাবে এ জলজপ্রাণী নির্মূল হতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পাবনার প্রাকৃতিক ও জনজীবনে মহাবিপদ নেমে আসবে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০১২ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে শামুককে বন্যপ্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ এ আইন অমান্য করেই প্রতি বছর চলছে শামুক নিধন। শামুক সংগ্রহের অপরাধে জেলসহ অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ আইন প্রয়োগ না হওয়ায় থামছে না শামুক সংগ্রহ। এ অবস্থায় ওয়াকেবহাল মহলে শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ বন্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়াসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

শামুক নিধন সম্পর্কে পাবনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীপক কুমার পাল সাংবাদিকদের বলেন, বিল বা খালে শামুক প্রয়োজনীয় হারের তুলনায় এভাবে কম হয়ে গেলে সেটি মাছ বা জলজ অন্যান্য প্রাণীর জন্যও ক্ষতিকর বিষয়। তবে অবাধে শামুক শিকার রোধের বিষয়টি আমাদের দেখার তেমন সুযোগ নেই। ফলে আমরা তেমন পদক্ষেপ নিতে পারি না।

রাজশাহী বিভাগীয় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী পরিদর্শক মো. জাহাঙ্গীর কবীর জানান, সরকারের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ অনুযায়ী শামুক সংগ্রহ, ধ্বংস, ভক্ষণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রফতানি করা দন্ডনীয় অপরাধ। যার সর্বোচ্চ শাস্তি দুই বছর কারাদন্ড এবং এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। তারপরেও শামুক নিধন রোধ করা যাচ্ছে না। কারণ আমাদের নানা দূর্বলতা রয়েছে। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি।

আবাদ হচ্ছে ৯ লাখ টন পেঁয়াজ

শেষের পৃষ্ঠার পর : থেকে ৪৫ দিনে চারা হবে। সেই চারা লাগানো হবে জমিতে। আর চারা থেকে তিন মাসের মধ্যে হবে পরিপক্ক পেঁয়াজ। এবার মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি ও বিলের পানি দেরিতে শুকানোর কারণে বীজতলা তৈরির কাজ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। একই এলাকার কৃষক হাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমানে বীজ, সারসহ চাষাবাদে আনুষঙ্গিক সব কিছুর দাম বৃদ্ধিতে চাষাবাদে খরচ বেড়ে গেছে। তিনি বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানীর বিরোধিতা করে বলেন, পেঁয়াজ রোপনে যে খরচ হচ্ছে তাতে করে ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ আমদানি করলে আমাদের পথে বসতে হবে। নাজিরগঞ্জ এলাকার কৃষক মানিক মিয়া ও শাজাহান আলী বলেন, বর্তমানে যে আবহাওয়া আছে সেটা বীজতলার জন্য উপযোগী। এই আবহাওয়া থাকলে ভাল চারা হবে এবং তাতে করে ভাল ফলনের আশা করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি পাবনার উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক জানান, চলতি বছর পাবনায় ৬ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের বীজতলা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

চাটমোহরে নারী নেতৃত্বে

শেষের পৃষ্ঠার পর : বেশি। এ কারণে উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন বিন-হালে রসুন আবাদ হচ্ছে।

চাষীরা বলেন, বিনাহালে রসুন বপন করে আমরা প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পাই। তাতে করে বেশ কিছুদিন কাজ করলে বাড়তি আয় হয়। আবার রসুন জমি থেকে তোলার পর আমাদেরই বাছাইয়ের জন্য কাজ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে এমন চাষ পদ্ধতি আমাদের ভালো একটা আয়ের উৎস।

ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের বালুদিয়ার গ্রামের কৃষক জিয়উল হক জানান, ৫ বিঘা জমিতে তিনি বিনাহালে রসুন আবাদ করেছেন। আমন ধান কাটার পর জমি থেকে আগাছা পরিস্কার করে জমি ভেজা বা কাঁদা মাটি থাকতেই প্রতি এক বিঘা জমিতে ৩০ কেজি টিএসপি, ২৫ কেজি পটাশ এবং ১৫ কেজি জীপসাম সার ছিটানোর পরের দিনই সারিবদ্ধভাবে বীজ রোপন করতে হয়। এক বিঘা জমিতে ২ মণ বীজ লাগে। বীজ রোপন করার পরই খড় বা বিচালি দিয়ে পুরো জমি ঢেকে দিতে হয়। এক মাস পর পানি সেচ দিয়ে ১০ কেজি ইউরিয়া সার দিতে হয় বিঘাপ্রতি। এই পদ্ধতিতে রোগ বালাই নেই বললেই চলে। একশ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে ওঠে। বিঘাপ্রতি উৎপাদন হয় ২৫ থেকে ৩০ মণ।

বিলচলন ইউনিয়ন বোঁথর গ্রামের কৃষক আরিফুল ইসলাম জানান, এ বছর ৭ বিঘা জমিতে তিনি বিনাহালে রসুন আবাদ করেছেন। এক বিঘা জমিতে সব মিলিয়ে খরচ হয় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। তবে কৃষিশ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় খরচও বেড়েছে। তারপরও দাম কম হলেও ৬০ হাজার টাকার রসুন বিক্রি করা হয়। দাম বেশি হলে লক্ষাধিক টাকার বেশি পাওয়া যায়।

কৃষি অফিস সূত্র জানায়, আমনের আবাদ শেষে বেশ কিছুদিন মাটি কর্দমাক্ত থাকার কারণে কাঙ্ক্ষিত রবিশস্য চাষ করা সম্ভব হয়না। যার ফলে জমি পতিত পরে থাকে। সেই সময়টাকেই কাজে লাগিয়ে আবাদ করা হচ্ছে বিনাহালের রসুন। এ চাষে বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা দেখছেন কৃষক এবং তারা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ কুন্তলা ঘোষ জানান, বিনাহালে রসুন আবাদে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও কৃষকদের সহযোগিতা দিলে বড় রকমের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর (অব.) শিবজিত কুমার নাগ, প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি) ও ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. ইমরান কবীর-এর সঙ্গে ফটো সেশনে অংশ নিয়েছে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সায়াদাত, শান্ত, সাওম, চুড়া ও আফিয়া

গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের আটজন শিক্ষার্থী অসাধারণ মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে Blue Bells International Model United Nations (BBIMUN) ২০২৫ -এ শীর্ষস্থানীয় পর্যায়সমুহের প্রতিটিতেই পুরস্কার লাভের মাধ্যমে গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছে।

এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল ২০২৩ সালে। তারপর থেকে প্রতি বছরই বিদ্যালয়ের MUN দল অসাধারণ অগ্রগতি, আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। এ বছরেও প্রতিষ্ঠানটির একদল শিক্ষার্থী টানা দুই দিন- প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে 'টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন' শীর্ষক বিষয়ে উপস্থাপন, বিশ্লেষণ, বিতর্ক, এবং তীব্র আলোচনায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে থেকেই ৩ জন সর্বোচ্চ ৩টি স্থান অধিকার করে বিজয়ী হয় এবং এওয়ার্ড পায়। বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে- সাওম খান (Best Delegate Award), মো. সাইফ ইকবাল শান্ত (Special Mention Award) ও মোছা. তাসফিয়া সুমাইয়া (Verbal Mention Award)। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী জিসান আল মাহমুদ নয়ন, নুসরাত জাহান খান ইপশিতা, কে.এম আবদুল্লাহ আল নোমান, সানিয়া সরকার, এ.কে.এম নাজমুস সায়াদাত, আফিয়া জাহিন, রোহিত পাল, আবদুল্লাহ আল তাসনিম পিয়াস, অপরাহ্ন সাহা, চূড়া সান্যাল ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস (IMUN) ছাড়াও ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, জাতীয় অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছে।

ব্যতিক্রমী প্রতিভা সাওম খান

বর্তমান ২০২৫ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক রুটিন পাঠ্য কার্যক্রমের বাইরে জেলা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা সহায়ক স্বীকৃত কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রশংসার যোগ্য। সেইসকল শিক্ষার্থীর মাঝে তৃতীয় শ্রেণী থেকে এসএসসি-এর এই প্রতিষ্ঠানটির কৃতি শিক্ষার্থী সাওম খান (এসএসসি-২০২৫ ব্যাচ) গণিত, বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সে তার বহুমুখী মেধা ও অধ্যাবসায় দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় অঙ্গনে স্কুল পর্যায়ে পাবনা জেলার জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। তার এই বিস্তৃত সাফল্যের তালিকা যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

সাওমের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে গণিত অলিম্পিয়াডের দুটি প্রধান প্রতিযোগিতায় পদক জয়। সে 'Banglar Math Team Championship'-এ Silver Medal এবং প্রথম রানার আপ (1st runner up) হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পাশাপাশি 'Banglar Math Excellency Championship'-এ Bronze Medal লাভ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এছাড়াও সে ভাষা প্রতিযোগিতায়ও নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছে; English Olympiad-এ সে অর্জন করে Bronze Medal।

বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও সাওমের আগ্রহ ও সাফল্য অনস্বীকার্য। সে Bangladesh Space Olympiad-এর জাতীয় পর্বে Top ১০-এ স্থান করে নেয় এবং Bangladesh Junior Science Olympiad-এর জাতীয় রাউন্ডে Medal লাভ করে। সে Bangladesh Space Olympiad, English Olympiad, BMEC and BMTC Math Olympiad, Bangladesh Junior Science Olympiad এবং Gonitbid2025-এর মতো জাতীয় প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও, Robot Olympiad, Climate Science Olympiad, Bangladesh Mathematics Olympiad, Bangladesh Physics Olympiad এবং ICT Olympiad এ তার অর্জন প্রতিষ্ঠানের জন্য গৌরবের।

শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজের মেধার স্বাক্ষর রাখার সুযোগ তৈরি করেছে সাওম। সে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ International Astronomy and Astrophysics Competition, World Mathematics Team Championship এবং Climate Science Olympiad-এর আন্তর্জাতিক পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। তার জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় মডেল ইউনাইটেড নেশন্স (MUN)-এর মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির এই প্ল্যাটফর্মে সে একাধিকবার সেরা স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে BBIMUN 2023-এ Verbal Mention,EXPMUN-G Honourable Mention, HIC-MUN-G Best Researcher Ges MedMUN-এ Honourable Mention। এই ধারবাহিক সাফল্যের চূড়ায় সে সম্প্রতি BBIMUN 2025-এ Best Delegate হিসেবে নির্বাচিত হয়।

ম্যাথ অলিম্পিয়াড ন্যাশনাল রাউন্ড-২০২৫ এ পুরস্কারপ্রাপ্ত সাওম খান

ইংলিশ অলিম্পিয়াড ন্যাশনাল রাউন্ড-২০২৫ পুরস্কার গ্রহন করছে সাওম খান

বিজ্ঞাপন নম্বর : এস.বি.০০০/৪৩

সৌজন্যে : শিবানী নাগ স্মৃতিকেন্দ্র, পাবনা।